LJ VIII B.

# চয়নিকা

ক্ষেত্র গুপ্ত

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book of Bengali for Class VIII Vide Notification No. T. B. 76/8/TB/64 and also Board's letter No. nil dated 27.11.76

# চয়নিকা

( তৃতীয় ভাগ )

[ অষ্টম শ্রেণীর জন্য ]

**ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত** এম. এ. ( স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ), পি-এইচ. ডি, ডি. লিট
বিদ্যাসাগর অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ.
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

Library
Calcutta
25/3. B. T. Road

গ্রন্থনিলয় ৫৯/১বি পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীপ্রেমময় মজুমদার
৫৯/১ বি. পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

S.C.E.R.T. West Bengal
Date 17/2/92
Acc No 5170

891.44
KSH

নবম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারি, ১৯৮৮

সরকারি কাগজে মুদ্রিত

মূল্য ঃ সাত টাকা পঞ্চাশ সয়সা মাত্র

S8
HRI
KHE

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীকিঙ্করকুমার নায়ক
নায়ক প্রিণ্টার্স
৮১/১-ই, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

# বিষয়-সূচী

## গদ্যাংশ


| | বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১। | ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ... | ১ |
| ২। | বিদ্যাসাগরের জিদ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ... | ৬ |
| ৩। | গঙ্গার শোভা—স্বামী বিবেকানন্দ | ... | ১১ |
| ৪। | মন্ত্রের সাধন—জগদীশচন্দ্র বসু | ... | ১৪ |
| ৫। | চন্দ্রগুপ্ত ও সেকেন্দার—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় | ... | ১৯ |
| ৬। | রাজদ্বারে শ্মশানে চ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ... | ২৪ |
| ৭। | বঙ্গভঙ্গ—যোগেশচন্দ্র বাগল | ... | ২৯ |
| ৮। | সেনাপতি শিবনাথ—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ৩৩ |
| ৯। | যাত্রার আসরে অপু—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ৩৭ |
| ১০। | নীলবিদ্রোহ—শিবনাথ শাস্ত্রী | ... | ৪২ |
| ১১। | ইংরাজ-পূর্ব বাংলার ঐশ্বর্য—সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় | ... | ৪৬ |
| ১২। | কাবুলের বাজার—সৈয়দ মুজতবা আলী | ... | ৫০ |
| ১৩। | মহানিক্রমণ—শিশিরকুমার বসু | ... | ৫৩ |
| ১৪। | মহাকাশ অভিযান ও আর্যভট্ট—জিতেন্দ্রকুমার গুহ | ... | ৬০ |

## পদ্যাংশ


| বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। হনু-ভানু মিতালি—কৃত্তিবাস ওঝা | ... | ৬৩ |
| ২। মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন—ভারতচন্দ্র রায় | ... | ৬৬ |
| ৩। মেঘনাদের মৃত্যু—মধুসূদন দত্ত | ... | ৬৮ |
| ৪। ভারতসঙ্গীত—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ৭২ |
| ৫। সমুদ্র-দর্শন—বিহারীলাল চক্রবর্তী | ... | ৭৪ |
| ৬। জন্মান্তর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ... | ৭৭ |
| ৭। বালক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ... | ৮০ |
| ৮। জাতির পাঁতি—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত | ... | ৮২ |
| ৯। হয়তো—কুমুদরঞ্জন মল্লিক | ... | ৮৪ |
| ১০। মানুষ - যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত | ... | ৮৬ |
| ১১। কুলি-মজুর—নজরুল ইসলাম | ... | ৮৮ |
| ১২। আমি কবি—প্রেমেন্দ্র মিত্র | ... | ৯১ |
| ১৩। আবার আসিব ফিরে—জীবনানন্দ দাশ | ... | ৯৩ |
| ১৪। নইলে—অজিত দত্ত | ... | ৯৫ |
| ১৫। মৌমাছি—দিনেশ দাস | ... | ৯৭ |
| ১৬। একটি মোরগের কাহিনী—সুকান্ত ভট্টাচার্য | ... | ৯৯ |
| পরিশিষ্ট ঃ বিশেষ আলোচনা | ... | ১০২ |



# ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

**লেখক-পরিচয়**। জন্ম—২৬শে জুন, ১৮৩৮, মৃত্যু—৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪। ২৪ পরগনা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রকে 'সাহিত্যসম্রাট' নামে অভিহিত করা হয়। হুগলী কলেজে ছাত্রাবস্থা হইতেই ইঁহার সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত হয়। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে ইঁহার অবদান অপরিসীম। বঙ্কিমের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির নাম হইল ঃ দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি। প্রবন্ধসাহিত্যেও বঙ্কিম অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। ইঁহার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থের নাম ঃ বিজ্ঞানরহস্য, সাম্য, লোকরহস্য, কৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি। 'বাংলা গদ্যকে রূপ ও গুণের দিক দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একেবারে চরম সীমায় লইয়া গেলেন। উপন্যাস ও প্রবন্ধ দুই শ্রেণীর লেখায়ই তিনি মাতৃভাষাকে শ্রেষ্ঠসাহিত্য করিয়া তুলিলেন।' যে-কোন চিন্তা প্রকাশ করিতে, যে-কোন ভাব ফুটাইয়া তুলিতে, যে-কোন বর্ণনায় তিনি দক্ষতা দেখাইয়াছেন।

[ **রচনা-পরিচয়**। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সুবিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দমঠ'-এর আরম্ভে ৭৬ সালের দুর্ভিক্ষের একটি বাস্তব এবং মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়াছিলেন। সেই বর্ণনার একটি অংশ এখানে সংগ্রহ করা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার ও বর্ণনাশক্তির নিদর্শন এখানে মিলিবে। )

## এক

১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময় কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই, ভিক্ষার দিন ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপক টোল বন্ধ করিয়াছে, শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে

মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুক্কুর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ্য হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গায়িল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পর দুইসন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র-ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপর কে ভিক্ষা দেয়! —উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিল। জোতজমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল—জ্বর, ওলাওঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে! কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পালায়।

## দুই

কাল ৭৬ সাল ঈশ্বরকৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালার ছয় আনা রকম মানুষকে,

—কত কোটি তা কে জানে,—যমপুরে প্রেরণ করাইয়া সেই দুর্বৎসর নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। সুবৃষ্টি হইল, পৃথিবী শস্যশালিনী হইল, যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহারা পেট ভরিয়া খাইল। অনেকে অনাহারে বা অল্পাহারে রুগ্ন হইয়াছিল, পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য করিতে পারিল না। অনেকে তাহাতেই মরিল। পৃথিবী শস্যশালিনী, কিন্তু জনশূন্য। গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ি পড়িয়া পশুগণের বিশ্রামভূমি এবং প্রেতভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে শত শত উর্বর ভূমিখণ্ডসকল অকর্ষিত, অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়া রহিল, অথবা জঙ্গলে পুরিয়া গেল। দেশ জঙ্গলে পূর্ণ হইল। যেখানে হাস্যময় শ্যামল শস্যরাশি বিরাজ করিত, যেখানে অসংখ্য গো-মহিষাদি বিচরণ করিত, যে-সকল উদ্যান গ্রাম্য যুবক-যুবতীর প্রমোদভূমি ছিল, সে-সকল ক্রমে ঘোরতর জঙ্গল হইতে লাগিল। এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর গেল। জঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যে স্থান মনুষ্যের সুখের স্থান ছিল, সেখানে নরমাংস-লোলুপ ব্যাঘ্র আসিয়া হরিণাদির প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। যেখানে সুন্দরীর দল অলক্তাঙ্কিতচরণে চরণভূষণ ধ্বনিত করিতে করিতে, বয়স্যার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতে করিতে উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে যাইত, সেইখানে ভল্লুকে বিবর প্রস্তুত করিয়া শাবকাদি লালন-পালন করিতে লাগিল। যেখানে শিশুসকল নবীন বয়সে সন্ধ্যাকালের মল্লিকাকুসুমতুল্য উৎফুল্ল হইয়া হৃদয়তৃপ্তিকর হাস্য হাসিত, সেইখানে আজি যূথে যূথে বন্য হস্তিসকল মত্ত হইয়া বৃক্ষের কাণ্ডসকল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। যেখানে দুর্গোৎসব হইত, সেখানে শৃগালের বিবর, দোলমঞ্চে পেচকের আশ্রয়, নাটমন্দিরে বিষধর সর্পসকল দিবসে ভেকের অন্বেষণ করে। বাঙ্গালায় শস্য জন্মে, খাইবার লোক নাই ; বিক্রেয় জন্মে, কিনিবার লোক নাই ; চাষায় চাষ করে, টাকা পায় না—জমীদারের খাজনা দিতে পারে না ; জমীদারেরা রাজার খাজনা দিতে পারে না। রাজা জমীদারি কাড়িয়া লওয়ায় জমীদারসম্প্রদায় সর্বহৃত হইয়া দরিদ্র হইতে লাগিল। বসুমতী বহুপ্রসবিনী হইলেন, তবু আর ধন জন্মে না। কাহারও ঘরে ধন নাই। যে যাহার পায় কাড়িয়া খায়। চোর-ডাকাতেরা মাথা তুলিল, সাধু ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে লুকাইল।

## অনুশীলনী

১। পদচিহ্ন গ্রামের কি অবস্থা হইয়াছিল ? উহার কারণ কি ?

২। ৭৬ সালের মন্বন্তরের কারণ কি ? ইহার পিছনে প্রকৃতি ও মানুষ কাহার কি ভূমিকা ছিল ?

৩। মহম্মদ রেজা খাঁ কে ? দেশে দুর্ভিক্ষ ঘটিবার ব্যাপারে তাঁহার কতখানি দায়িত্ব ছিল ?

৪। দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভে লোক কি কি বেচিতে লাগিল? কেনা-বেচা পরে বন্ধ হইয়া গেল কেন? লোকের কি অবস্থা হইল? অনাহারের সঙ্গে রোগ দেখা দেওয়ায় কি ফল ফলিল?

৫। দুর্ভিক্ষের পূর্বে দেশের কি অবস্থা ছিল? পরে কি অবস্থা হইল?

৬। বঙ্কিমচন্দ্র ৭৬ সালের দুর্ভিক্ষের কি কি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন?

৭। 'বাঙ্গালায় শস্য জন্মে, খাইবার লোক নাই'—কেন? কোন্ সময়ে কোন্ দেশে এরূপ অবস্থা হইয়াছে?

৮। ৭৬-এর মন্বন্তরের সময়ে দেশের লোক কি কি কারণে মারা গিয়াছিল? (শুধু কারণগুলি উল্লেখ কর)।

৯। বঙ্কিমচন্দ্র দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দেশের যে মর্মন্তুদ চিত্র আঁকিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

১০। "যেখানে হাস্যময়…হইতে লাগিল।" এই অংশটি কোন্ রচনা হইতে সঙ্কলিত? প্রসঙ্গ নির্দেশ কর। লেখকের বক্তব্য নিজের ভাষায় বুঝাইয়া দাও।

১১। "যেখানে দুর্গোৎসব হইত…অন্বেষণ করে।" এই অংশটি কোন্ রচনা হইতে উদ্ধৃত? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে? লেখকের বক্তব্য বিশ্লেষণ কর।

১২। "চোর-ডাকাতেরা…মধ্যে লুকাইল।" এই অংশটি কোন্ লেখকের কোন্ রচনা হইতে গৃহীত? প্রসঙ্গ উল্লেখ কর। উদ্ধৃতাংশের বক্তব্য বুঝাইয়া দাও।

১৩। সমাস ও ব্যাসবাক্য নির্ণয় কর: কালগ্রাস, বিশ্রামভূমি, জনশূন্য, প্রেতময়, অলক্তাঙ্কিতচরণে, চরণভূষণ, মল্লিকাকুসুমতুল্য, রোগাক্রান্ত।

১৪। ১৩নং প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখ।

১৫। ক্রিয়ার কাল নির্ণয় কর:—খাইতে লাগিল, বেচিতে চায়, বাড়াইয়া দিল, ভয়ে পলায়, হাসিতে হাসিতে যাইত।

১৬। পদপরিবর্তন কর:—আশ্রয়, মদমত্ত, ধ্বনিত, দরিদ্র, উৎফুল্ল, প্রস্তুত, চিকিৎসা, বন্য, রুগ্ন, শ্যামল, মহার্ঘ্য, নীরব, নীচ।

## মৌখিক প্রশ্ন

১। নাটমন্দির কাকে বলে?

২। ছিয়াত্তরের সাল ইতিহাসে কুখ্যাত কেন?

৩। এই শতাব্দীর কোন্ সালে বাংলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়?

৪। এই রচনাটি কোন্ গ্রন্থের অংশ?

৫। এই লেখকের আর একটি বইয়ের নাম কর।

৬। হাট আর বাজারের মধ্যে পার্থক্য কি?

৭। রেজা খাঁ কে ?

৮। দুর্ভিক্ষের সময় সে কি করল ?

### অতিরিক্ত মন্তব্য

১। ভারী শব্দগুলির গাম্ভীর্য লক্ষ্য করবার মতো। যেমন—মল্লিকা-কুসুমতুল্য, হৃদয়তৃপ্তিকর, শস্যশালিনী, নরমাংস-লোলুপ, অলক্তাঙ্কিত-চরণে, চরণভূষণ, হস্তিসকল, মদমত্ত, দুর্গোৎসব, বহুপ্রসবিনী। এগুলি তৎসম শব্দ, সমাসবদ্ধ পদ।

২। তৎসম ভারী শব্দের পাশে একান্ত সহজ সাদামাটা বহু শব্দও আছে। যেমন—চোরডাকাতেরা মাথা তুলিল; খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়; গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিল, জোতজমা বেচিল।

এই দুই ধরনের শব্দ ঠিকভাবে মিশ্রণ ও প্রয়োগের মধ্যেই বঙ্কিমের কৃতিত্ব।




**লেখক-পরিচয়।** বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বিস্ময়কর নাম। মুখ্যত কবি হিসাবেই তাঁহার পরিচয় ও খ্যাতি, কিন্তু সাহিত্যের সকল বিভাগই তাঁহার দানে সমৃদ্ধ, প্রতিভার স্পর্শে বর্ণময়। কবিতা, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সঙ্গীত, চিত্রকলা—কোথাও তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভার দান অকিঞ্চিৎকর নয়। স্বদেশে সর্বত্রই তিনি বিপুলভাবে অভিনন্দিত হইয়াছেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্যিকের সর্বোচ্চ গৌরব নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতেই নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন তাঁহার সমকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। ১২৬৮ সালের ( ১৮৬১ খ্রীঃ ) ২৫ বৈশাখ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৩৪৮ সালের ( ১৯৪১ খ্রীঃ ) ২২শে শ্রাবণ তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার পিতা এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার পিতামহ। মাতার নাম সারদা দেবী। তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির নাম দেওয়া হইল ঃ কাব্য—মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, বলাকা, গীতাঞ্জলি, মহুয়া, পুনশ্চ, প্রান্তিক প্রভৃতি। উপন্যাস—রাজর্ষি, গোরা, ঘরে বাইরে প্রভৃতি। নাটক—ডাকঘর, রক্তকরবী, রাজা, ফাল্গুনী প্রভৃতি। প্রবন্ধ—কালান্তর, সভ্যতার সংকট, বিশ্বপরিচয় প্রভৃতি।

[ **রচনা-পরিচয়।** একজন মহাপুরুষ পূর্বের আর-এক মহাপুরুষের চরিত্রের রহস্য নিচের রচনাটিতে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য সুন্দর গদ্যরীতির পরিচয় যেমন এখানে পাওয়া যাইবে, তেমনি তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিরও নিদর্শন মিলিবে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের গভীরে দৃষ্টিপাতও করা যাইবে। ]

বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে গোপাল নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তাহাকে বাপ-মায়ে যাহা বলে সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন তখন গোপালের অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক্, পিতা যাহা বলিতেন তিনি ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বসিতেন। শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন—"পিতা

তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যেদিন সাদা বস্ত্র না থাকিত সেদিন বলিতেন, আজ ভালো কাপড় পরিয়া কলেজে যাইতে হইবে। তিনি হঠাৎ বলিতেন, না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যেদিন বলিতেন, আজ স্নান করিতে হইবে, শ্রবণমাত্র দাদা বলিতেন যে, আজ স্নান করিব না ; পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া ট্যাঁকশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড়-চাপড় মারিয়া জোর করিয়া স্নান করাইতেন।"

পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সের সময় যখন গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন তখন প্রতিবেশী মথুর মণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়া দিবার জন্য যে প্রকার সভ্যাবিগর্হিত উপদ্রব তিনি করিতেন বর্ণপরিচয়ের সর্বজননিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনও করে নাই।

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ-দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনী লেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালী জাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাস করিয়া ভালো চাকরি-বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিল।

কিন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সহিত তাহার জীবনচরিত-লেখকের সাদৃশ্য ছিল না। রাখাল পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে, মিছামিছি দেরি করিয়া সকলের শেষে পাঠশালায় যায়। কিন্তু পড়াশুনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। যে প্রবল জিদের সহিত তিনি পিতার আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই দুর্দম জিদের সহিত তিনি পড়িতে যাইতেন। সেও তাঁহার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে নিজের জিদ রক্ষা। ক্ষুদ্র একগুঁয়ে ছেলেটি মাথায় এক মস্ত ছাতা তুলিয়া তাঁহাদের বড়োবাজারের বাসা হইতে পটলডাঙ্গায় সংস্কৃত কলেজে যাত্রা করিতেন, লোকে মনে করিত একটা ছাতা চলিয়া যাইতেছে। এই দুর্জয় বালকের শরীরটি খর্ব, শীর্ণ, মাথাটা প্রকাণ্ড—স্কুলের ছেলেরা সেজন্য তাঁহাকে 'যশুরে কৈ' ও তাহার অপভ্রংশ 'কসুরে জৈ' বলিয়া খেপাইত ; তিনি তখন তোৎলা ছিলেন, রাগিয়া গেলে কথা বলিতে পারিতেন না।

এই বালক রাত্রি দশটার সময় শুইতে যাইতেন। পিতাকে বলিয়া যাইতেন, রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহাকে জাগাইয়া দিতে। পিতা আর্মানি গির্জার ঘড়িতে বারোটা বাজিলেই ঈশ্বরচন্দ্রকে জাগাইতেন, বালক অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া পড়া করিতেন। ইহাও একগুঁয়ে ছেলের নিজের শরীরের প্রতি জিদ। শরীরও তাহার প্রতিশোধ তুলিতে ছাড়িত না। মাঝে মাঝে কঠিন

সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু পীড়ার শাসন তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই।

তাঁহার মতো অবস্থাপন্ন ছাত্রের পক্ষে বিদ্যালাভ করা পরম দুঃসাধ্য, কিন্তু এই গ্রাম্যবালক শীর্ণ খর্বদেহ এবং প্রকাণ্ড মাথা লইয়া আশ্চর্য অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতো দরিদ্রাবস্থার লোকের পক্ষে দান করা, দয়া করা বড়ো কঠিন, কিন্তু তিনি যখন যে অবস্থায়ই পড়িয়াছেন, নিজের কোনো প্রকার অসচ্ছলতা তাঁহাকে পরের উপকার হইতে বিরত করিতে পারে নাই। এবং অনেক মহৈশ্বর্যশালী রাজা রায় বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধি লাভ করিতে পারে নাই, এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান সেই 'দয়ার সাগর' নামে বঙ্গদেশে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।

কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত ও পরে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। এই কার্যোপলক্ষে তিনি যে-সকল ইংরাজ প্রধান কর্মচারীদের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন, সকলেরই পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশের মর্যাদা নষ্ট করিয়া ইংরাজের অনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাহেবের হস্ত হইতে শিরোপা লইবার জন্য কখনো মাথা নত করেন নাই; তিনি আমাদের দেশের ইংরাজ-প্রসাদগর্বিত সাহেবানুজীবীদের মতো আত্মাবমাননার মূল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। একটা উদাহরণে তাহার প্রমাণ হইবে। একবার তিনি কার্যোপলক্ষে হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল্ কার-সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সভ্যতাভিমানী সাহেব তাঁহার বুট-বেষ্টিত দুই পা টেবিলের উপর ঊর্ধ্বগামী করিয়া দিয়া বাঙালী ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রতারক্ষা করা বাহুল্য বোধ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ঐ কার-সাহেব কার্যবশতঃ সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে আসিলে বিদ্যাসাগর চটিজুতাসমেত তাঁহার সর্বজনবন্দনীয় চরণযুগল টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া এই অহংকৃত ইংরাজ অভ্যাগতের সহিত আলাপ করিলেন। বোধ করি শুনিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না, সাহেব নিজের এই অবিকল অনুকরণ দেখিয়া সন্তোষলাভ করেন নাই।

### অনুশীলনী

১। গোপাল এবং রাখাল কাহারা? বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ইহাদের কি সম্পর্ক? বালক বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কাহার মিল দেখিতে পাইয়াছেন? কেন?

২। বালক বিদ্যাসাগরের মধ্যে রাখালের মতো স্বভাব লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করিলেন কেন?

৩। রাখালের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কোন্ দিকে সাদৃশ্য ছিল? কোন্ দিকে ছিল বৈসাদৃশ্য?

৪। বালক বিদ্যাসাগর কিভাবে স্কুলে যাইতেন? অন্যান্য বালকেরা তাঁহাকে কি বলিয়া খেপাইত? কেন?

৫। নবদ্বীপের শচীমাতার দুরন্ত ছেলে কে? তাঁহার সঙ্গে কাহার তুলনা করিয়াছেন লেখক? কেন এরূপ তুলনা করিলেন?

৬। বিদ্যাসাগর বালক বয়সে কিভাবে বিদ্যাভ্যাস করিতেন? তাঁহার পক্ষে বিদ্যাভ্যাসের কি বাধা ছিল?

৭। বিদ্যাসাগরের অপর উপাধি কি ছিল? এইরূপ উপাধির কারণ কি?

৮। কলেজ হইতে বাহির হইয়া তিনি কোথায় কোথায় কি কি কর্মে নিযুক্ত হন?

৯। তখন হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল কে ছিলেন? তিনি বিদ্যাসাগরের সহিত কখন কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন? বিদ্যাসাগর কিভাবে ইহার প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন? এই ঘটনায় তাঁহার স্বভাবের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

১০। "এই দরিদ্র পিতার···হইয়া রহিলেন।" উদ্ধৃত অংশটি কাহার লেখা? কোন্ রচনার অন্তর্গত? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে? বক্তব্যের তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

১১। "কিন্তু বিদ্যাসাগরের হস্ত হইতে···চেষ্টা করেন নাই।" উদ্ধৃত অংশটি কাহার লেখা? কোন্ রচনার অন্তর্গত? প্রসঙ্গ উল্লেখ কর। বক্তব্য নিজের ভাষায় বুঝাইয়া দাও।

১২। "নিরীহ বাংলাদেশে···ঘুচিয়া যাইতে পারে।" উদ্ধৃত অংশটি কাহার লেখা? কোন্ রচনা হইতে গৃহীত? প্রসঙ্গ নির্দেশ কর। উদ্ধৃতাংশের বক্তব্য বুঝাইয়া বল।

১৩। সমাস লেখ ও ব্যাসবাক্য নির্ণয় কর:—সাহেবানুজীবী, আত্মাবমাননা, ইংরাজপ্রসাদগর্বিত, ভদ্রতারক্ষা, জীবনচরিত-লেখক, খর্বদেহ, সর্বজনবন্দনীয়।

১৪। পদ পরিবর্তন কর:—বিক্রীত, অনুকরণ, সন্তোষ, বন্দনীয়, অহংকৃত, ভদ্রতা, সভ্যতাভিমানী, বাহুল্য।

১৫। সন্ধিবিচ্ছেদ কর:—অবস্থাপন্ন, সভ্যতাভিমানী, দরিদ্রাবস্থা, আত্মাবমাননা, দুর্দম, কার্যোপলক্ষে।

১৬। ১৪নং প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখ।

১৭। 'কসুরে জৈ' কথাটির অর্থ কি? কে কাহাকে কেন এই নাম দিয়াছিল?

### মৌখিক প্রশ্ন

১। বর্ণপরিচয় কার লেখা। কি ধরনের বই?

২। বিদ্যাসাগরের প্রকৃত নাম কি ? তাঁর অন্য উপাধি কি ?
৩। দয়ার সাগর বলতে কাকে বোঝায় ?
৪। শম্ভুচন্দ্র কে ?
৫। বর্ণপরিচয়ের ভালো ছেলে কে ? কে মন্দ ছেলে ?
৬। নবদ্বীপ কোথায় ? শচীমাতা কে ?
৭। শচীমাতার ছেলেকে দুরন্ত বলা হয়েছে কেন ?

### অতিরিক্ত মন্তব্য

রবীন্দ্রনাথের এই রচনাটি তৎসম-শব্দবহুল। শেষ অনুচ্ছেদটিতেই সমাসবদ্ধ দীর্ঘ তৎসম শব্দ আছে—

কার্যোপলক্ষে, প্রীতিভাজন, ইংরাজপ্রসাদগর্বিত সাহেবানুজীবীদের, আত্মাবমাননা, সভ্যতাভিমানী, সর্বজনবন্দনীয় প্রভৃতি।

লক্ষণীয় 'বুট-বেষ্টিত'—ইংরেজি শব্দকেও তৎসমের মতো রূপ দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে।



# গঙ্গার শোভা

স্বামী বিবেকানন্দ

**লেখক-পরিচয়।** স্বামী বিবেকানন্দ ( ১৮৬৩-১৯০২ ) ধর্মপ্রচারক, সেবাব্রতী সংগঠক ও চিন্তাবিদ্ মনীষী ছিলেন। তিনি 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' প্রভৃতি কয়েকটি বাংলা বইও লিখিয়াছিলেন ! তাঁহার রচনায় স্বদেশপ্রেম এবং সাম্যবাদী ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার রচনায় বাংলা চলিত ভাষা আশ্চর্য শক্তি নিয়া দেখা দিয়াছে।

[ **রচনা-পরিচয়।** স্বামী বিবেকানন্দ জাহাজে করিয়া ইউরোপের দিকে চলিয়াছেন। কলিকাতা হইতে গঙ্গার বুকে ভাসিয়া যাইতে যাইতে দুই তীরের এবং গঙ্গার জলধারার এই চিত্রটি তিনি আঁকিয়াছেন। তাঁহার চলিত গদ্য যেমন জোরালো তেমনি গভীর তাঁহার স্বদেশপ্রেম। এই দুই কারণে আলোচ্য রচনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ]

নদীমুখ বা বন্দর হ'তে জাহাজ রাত্রে প্রায় ছাড়ে না—বিশেষ কলিকাতার ন্যায় বাণিজ্যবহুল বন্দর, আর গঙ্গার ন্যায় নদী। কাজেই গঙ্গা থেকে বেরুতে আমাদের দুদিন লাগলো।

হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে ? সেই নির্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখনা গোনা যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদু হিমশীতল 'গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি' আর সেই অদ্ভুত 'হর হর হর' তরঙ্গোত্থধ্বনি শুনি, সামনে গিরিনির্ঝরের 'হর হর' প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জল পান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ ? সে গঙ্গাজলপ্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ্যবারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ, সে হিমালয়বাহিনী গঙ্গা, শ্রীনগর, টিহিরি, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, তোমাদের কেউ কেউ গোমুখী পর্যন্ত দেখেছ ; কিন্তু আমাদের কর্দমাবিলা, হরগাত্র বিঘর্ষণশুভ্রা, সহস্রপোতরক্ষা এ কলকাতার গঙ্গায় কি এক টান আছে তা ভোলবার নয়। সে কি স্বদেশপ্রিয়তা বা বাল্যসংস্কার কে জানে ?

আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা বোঁচা ভাই বোন ছেলেমেয়েদের চেয়ে গন্ধর্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্বলোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখবার কি আর জায়গা থাকে? এই অনন্ত শষ্পশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙলা দেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবার) আর কিছু কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময় মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্চে, রাশি রাশি তাল-নারিকেল খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইছে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ—এতে কি রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনার—বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ড হারবারের মুখ দিয়ে গঙ্গায় না প্রবেশ করলে সে বোঝা যায় না। সে নীল নীল আকাশ, তার কালো কালো মেঘ, তার কালো সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মতো হেলছে, তার ফিকে ঘন ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশানো—ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা আঁব-লিচু-জাম-কাঁটাল—পাতাই পাতা—গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্চে না, আশেপাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে, দুলছে আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দি ইরানী তুর্কিস্তানি গালচে-দুলচে কোথায় হার মেনে যায়! সেই ঘাস যতদূর চাও—সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস; কে যেন ছেঁটে ছেঁটে ঠিক করে রেখেছে; জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি ঢেকেছে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্চে, সে অবধি ঘাসে-আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা! একটি রঙে এত রকমারী আর কোথাও দেখেছ?

এইবার জাহাজ সমুদ্রে পড়ল।

কি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলজল তরঙ্গায়িত ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্চে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সে বিভূতি-ভূষণা, সামনে মধ্যবর্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা জলের একবার কালো জলের উপরে উঠছে। ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সামনে পেছনে আশেপাশে খালি নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীল কেশ, নীলকান্ত অঙ্গ-আভা, নীল পট্টবাস পরিধান। কোটি কোটি অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়েছিল, আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী; মহাগর্জন বিরাট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাস; দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েছে! তার মাঝে আমাদের অর্ণবপোত।

## অনুশীলনী

১। স্বামী বিবেকানন্দ হৃষীকেশের গঙ্গার কিরূপ শোভা বর্ণনা করিয়াছেন ? কলিকাতার গঙ্গার সঙ্গে তাহার পার্থক্য কোথায় ?

২। কলিকাতার গঙ্গার প্রতি আমাদের এত টানের কারণ কি ?

৩। গঙ্গার তীরবর্তী বাঙলার যে শোভা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বিবৃত কর।

৪। 'একটি রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেছ ?' কে কোথায় একথা বলিয়াছেন ? কোন্ রচনা হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে ? এই অংশটুকুর অর্থ ও তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

৫। গঙ্গা-মোহানার নিকটবর্তী সমুদ্রের কিরূপ শোভা বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে ?

৬। মহাগর্জন, বিকট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাস—শব্দগুলির অর্থ কি ; কোন্ প্রসঙ্গে এইগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে ?

৭। সমাস নির্ণয় কর ও ব্যাসবাক্য লেখ ঃ—সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী, গন্ধর্বলোক, পট্টবাস, মহাগর্জন, রণতাণ্ডব।

৮। 'এইবার জাহাজ সমুদ্রে পড়ল।' এই সমুদ্রের রূপ সম্বন্ধে পাঁচটি বাক্য লেখ।

৯। 'সে কি স্বদেশপ্রিয়তা বা বাল্যসংস্কার কে জানে ?' কে কোথায় কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলিয়াছেন ? কথাটির তাৎপর্য বুঝাইয়া বল।

১০। 'কোটি কোটি অসুর……মত্ত হয়েছে।' কে একথা বলিয়াছেন ? প্রসঙ্গ উল্লেখ কর। উদ্ধৃত অংশের বক্তব্য নিজের ভাষায় বুঝাইয়া বল।

১১। পদ পরিবর্তন কর ঃ—পীতাভ, লীলাময়, ফেনময়, মত্ত, কিনারাদার, নির্ভয়, যথার্থ, আহ্লাদ।

## মৌখিক প্রশ্ন

১। মাধুকরী ভিক্ষা কাকে বলে ?

২। উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী কি, কোথায় ?

৩। গঙ্গার শোভা কোন্ লেখকের কোন্ বইয়ের অংশ ?

৪। লেখকের অন্য নাম কি ছিল ?

৫। লেখক কোন্ কোন্ দেশের গালচের উল্লেখ করেছেন ?

৬। সমুদ্রের প্রচণ্ড গর্জনকে লেখক কোন্ পৌরাণিক প্রসঙ্গের সঙ্গে তুলনা করেছেন ?

## অতিরিক্ত মন্তব্য

ক। ঝাঁড় ঝাঁড় বাঁশ ; খ। শ্যাম শ্যাম ঘাস ; গ। ছেঁটে ছেঁটে ঠিক করে রেখেছে ; ঘ। খালি নীল নীল জল।

বিশেষণ পদগুলি দুবার করে ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে।

ক। প্রাচুর্য বোঝাচ্ছে। খ। অল্পের ভাব বোঝাচ্ছে।

গ। বারবার কাজটি করা বোঝাচ্ছে। ঘ। বিস্তারের ভাব আনছে।



# মন্ত্রের সাধন

## জগদীশচন্দ্র বসু



**লেখক-পরিচয়।** জন্ম ৩০শে নভেম্বর, ১৮৫৮ ; মৃত্যু ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭। ঢাকা জেলার রাড়িখাল গ্রামে জগদীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

জগদীশচন্দ্র ছিলেন খ্যাতিমান বৈজ্ঞানিক। ইংরেজী ভাষা ছাড়া বাংলা ভাষাতেও ইঁনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। ইঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে : **Response in the Living and Non-Living, Plant Response.** বাংলা ভাষায় 'অব্যক্ত' নামক একটি চমৎকার গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

[ **রচনা-পরিচয়।** বিখ্যাত বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্র বসু এই ছোট প্রবন্ধটিতে বিজ্ঞানীদের অসফল বিচিত্র সাধনারও যে কত মূল্য তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। অসফলতার মধ্য দিয়াই বিজ্ঞানীরা এক একটা বিরাট সাফল্যে গিয়া পৌঁছান। এই রচনায় মানুষের আকাশ-জয়ের সাধনার উত্তেজক কাহিনী পরিবেশন করা হইয়াছে। বিজ্ঞানীর রচনা এই নিবন্ধটিতে বাংলা গদ্য-ভাষা সরল ও প্রাণবন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ]

প্রশান্ত মহাসাগরে অনেকগুলি দ্বীপ দেখা যায়। এই দ্বীপগুলি অতি ক্ষুদ্র প্রবাল-কীটের পঞ্জরে নির্মিত। অগণ্য কীট নিজ নিজ দেহ দ্বারা বহু সহস্র বৎসরে এই দ্বীপগুলি নির্মাণ করিয়াছে।

আজকাল বিজ্ঞান দ্বারা যে সকল অসাধ্য সাধিত হইতেছে, তাহাও বহু লোকের চেষ্টার ফল। মানুষ পূর্বে একান্ত অসহায় ছিল। বুদ্ধি, চেষ্টা ও সহিষ্ণুতার বলে আজ সে পৃথিবীর রাজা হইয়াছে। কত কষ্ট ও কত চেষ্টার পর মনুষ্য বর্তমান উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। কে প্রথম আগুন জ্বালাইতে শিখাইল, কে প্রথমে ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা দিল, কে লেখার প্রথা আবিষ্কার করিল, তাহা আমরা কিছুই জানি না। এইমাত্র জানি যে প্রথমে যাঁহারা কোনও নূতন প্রথার প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা পদে পদে অনেক বাধা পাইয়াছিলেন। অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে অনেক নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই কষ্টের পরেও অনেকে তাঁহাদের চেষ্টা সফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আপাততঃ মনে হয়, তাঁহাদের চেষ্টা একেবারে বৃথা গিয়াছে, কিন্তু কোনও চেষ্টাই একেবারে বিফল হয় না। আজ যাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে হয়, দুই দিন পর তাহা হইতে মহৎ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রবাল দ্বীপ যেমন একটু একটু

করিয়া আয়তনে বর্ধিত হয়, জ্ঞানরাজ্যও সেইরূপ তিল তিল করিয়া বাড়িতেছে। এ সম্বন্ধে দুটি একটি ঘটনা বলিতেছি ঃ—প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে ইটালি দেশে গ্যাল্‌ভানি নামে একজন অধ্যাপক দেখিতে পাইলেন যে, লোহা ও তামার তার দিয়া মরা ব্যাঙকে স্পর্শ করিলে ব্যাঙ নড়িয়া উঠে। তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া এই ঘটনাটির সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপ সামান্য বিষয় লইয়া এত সময়ের অপব্যয় করিতে দেখিয়া লোকে তাঁহাকে উপহাস করিত। তাঁহার নাম হইল—"ব্যাঙ-নাচান অধ্যাপক"। বন্ধুরা আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "মরা ব্যাঙ যেন নড়িল, কিন্তু ইহাতে লাভ কি ?" কি লাভ ?—সেই যৎসামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া বিদ্যুতের বিবিধ গুণ সম্বন্ধে নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইতে আরম্ভ হইল। এই দেড়শত বৎসরের মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তি আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর ইতিহাসই যেন পরিবর্তিত হইয়াছে।

বিদ্যুৎদ্বারা পথঘাট আলোকিত হইতেছে, গাড়ি চলিতেছে, মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্তের সংবাদ অন্য প্রান্তে পৌঁছিতেছে। সমস্ত পৃথিবীটি যেন আমাদের ঘরের কোণে আসিয়াছে—দূর আর দূর নাই। পূর্বে আমাদের স্বর বাড়ির এক দিক হইতে অন্য দিকে পৌঁছিত না, এখন বিদ্যুতের বলে আমরা সহস্র ক্রোশ দূরের বন্ধুর সহিত কথাবার্তা বলিতেছি ; এমন কি, এই শক্তির সাহায্যে দূরদেশে কি হইতেছে, তাহা পর্যন্ত দেখিতে পাইব। আমাদের দৃষ্টি ও আমাদের স্বর আর কোন বাধা মানিবে না।

মনুষ্য এ পর্যন্ত জল এবং স্থলের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত আকাশ জয় করিতে পারে নাই। ব্যোমযানে শূন্যে উঠা যায় বটে ; কিন্তু বাতাসের প্রতিকূলে বেলুন চলিতে পারে না। আর এক অসুবিধা এই যে রেশমের বেলুন হইতে অল্প সময়ের মধ্যেই গ্যাস বাহির হইয়া যায় ; এজন্য বেলুন অধিকক্ষণ শূন্যে থাকিতে পারে না।

এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য সোয়ার্জ নামে একজন জার্মান অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর বেলুন প্রস্তুত করেন। অ্যালুমিনিয়াম কাগজের ন্যায় হাল্কা, অথচ ইহা ভেদ করিয়া গ্যাস বাহির হইতে পারে না। বেলুন যে ধাতু-নির্মিত হইতে পারে, ইহা কেহ বিশ্বাস করিত না। কিন্তু তিনি সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বহু বৎসর-ব্যাপী নিষ্ফল চেষ্টার পর অবশেষে বেলুন নির্মিত হইল। বেলুন যাহাতে ইচ্ছানুক্রমে বাতাসের প্রতিকূলে যাইতে পারে, এজন্য একটি ক্ষুদ্র 'এঞ্জিনও' তিনি প্রস্তুত করিলেন। জাহাজে যেমন জলের নীচে 'স্ক্রু' থাকে, এই স্ক্রু ঘুরাইলে জল কাটিয়া জাহাজ চলিতে থাকে, সেইরূপ বাতাস কাটিয়া চলিবার জন্য বেলুনে একটি বড় স্ক্রুও তিনি সংযুক্ত করিলেন। কিন্তু বেলুন নির্মিত হইবার অল্প পরেই সোয়ার্জের অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তিনি সমস্ত সম্পত্তি ও জীবন যে কার্যে পণ করিয়াছিলেন, তাহার ফল পরীক্ষা করিতে পারিলেন না ;

এতদিনের চেষ্টা নিষ্ফল হইতে চলিল। সোয়ার্জের সহধর্মিণী তখন জার্মান গভর্নমেণ্টের নিকট বেলুন পরীক্ষা করিবার জন্য আবেদন করিলেন। বিধবার দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া গভর্নমেণ্ট দয়া করিয়া সেই বেলুন পরীক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ-বিভাগের কতিপয় অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিলেন। পরীক্ষকেরা দেখিলেন, বেলুনটি অতি প্রকাণ্ড এবং ধাতুর নির্মিত বলিয়া রেশমের বেলুন অপেক্ষা অনেক ভারী। তারপর বেলুন চালাইবার জন্য এঞ্জিন ও অনেক কল বেলুনের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। এরূপ প্রকাণ্ড জিনিস কি কখনও আকাশে উড়িতে পারে! সে-সমস্ত কল অনাবশ্যক বলিয়া কাটিয়া ফেলা হইল, ঐ কলগুলি দ্বারা বেলুনকে ইচ্ছানুক্রমে দক্ষিণে, বামে, ঊর্ধ্বে ও অধোদিকেচালিত করা যাইত।

ইহার পর আরও এক বাধা পড়িল। বেলুন কে চালাইবে? যাহা হউক, দর্শকদিগের মধ্যে একজন 'ইঞ্জিনিয়ার' সাধ্যমত কল চালাইতে সম্মত হইলেন। কল চালানো হইল, অমনি বেলুন পৃথিবী ছাড়িয়া মহাবেগে শূন্যে উঠিল। তখন বাতাস বেগে বহিতেছিল, প্রতিকূল বাতাস কাটিয়া বেলুন ছুটিল। এতদিনে সোয়ার্জের চেষ্টা সফল হইল। কিন্তু লোকেরা যেসব কল অনাবশ্যক মনে করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিল স্বল্পকালের মধ্যেই তাহাদের আবশ্যকতা প্রমাণিত হইল। বেলুন আকাশে উঠিল বটে কিন্তু তাহা সামলাইবার কল না থাকাতে অল্পক্ষণ পরেই ভূমিতে পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল। তথাপি সকলে বুঝিতে পারিলেন, সোয়ার্জ যে অভিপ্রায়ে বেলুন নির্মাণ করিয়াছিলেন, তা কোনও দিন হয়ত সফল হইবে।

পাখিরা কত সহজে উড়িয়া বেড়ায়। মানুষ কি কখনও পাখির মতন উড়িতে পারিবে? তোমাদের কি কখনও পাখির মতো উড়িবার ইচ্ছা হয় নাই? জার্মান দেশের লিলিয়ানথাল মনে করিলেন, আমরা কেন পাখির মতো আকাশে ভ্রমণ করিতে পারিব না? তিনি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক পরীক্ষার পর নানাপ্রকার পাখা প্রস্তুত করিলেন এবং সেগুলি বাহুতে বাঁধিয়া পাহাড় হইতে ঝাঁপ দিয়া পাখায় ভর করিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন। একবার তাঁহার মনে হইল যে, দুইটি পাখার পরিবর্তে যদি অধিকসংখ্যক পাখার ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে উড়িবার বেশি সুবিধা হইতে পারে। চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, তাহাই ঠিক।

বিশ বৎসর পর্যন্ত অতি সাবধানে তিনি এইসব পরীক্ষা করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি যে কল প্রস্তুত করিলেন, তাড়াতাড়িতে তাহা পূর্বের মতন দৃঢ় হইল না, তিনি সেই অসম্পূর্ণ কল লইয়াই উঠিতে চেষ্টা করিলেন। একবার অতি সহজেই বাতাস কাটিয়া যাইতেছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ বাতাসের ঝাপটা লাগিয়া উপরের একখানা পাখা ভাঙ্গিয়া গেল। দুর্ঘটনায় তিনি প্রাণ হারাইলেন। কিন্তু তিনি পরীক্ষা দ্বারা যেসব নূতন তথ্য আবিষ্কার

করিলেন, তাহা পৃথিবীর সম্পত্তি হইয়া রহিল। তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বের সাহায্যে পরে উড়িবার কল-নির্মাণ সম্ভব হইয়াছে। ইহার পর মার্কিন দেশের অধ্যাপক ল্যাঙ্‌লি পাখাযুক্ত উড়িবার কল প্রস্তুত করিলেন, তাহাতে অতি হাল্কা একখানি ইঞ্জিন সংযুক্ত ছিল। কিন্তু কর্মকারের শৈথিল্যবশতঃ একটি স্ক্রু ঢিলা হইয়া গিয়াছিল। ইঞ্জিন চালাইবার পর কল আকাশে উঠিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। হঠাৎ ঢিলা স্ক্রু খুলিয়া যাওয়ায় কলটি নদী-গর্ভে পতিত হইল। এই বিফলতার দুঃখে ল্যাঙ্‌লি ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যুগ্রস্ত হইলেন।

ল্যাঙ্‌লির মৃত্যুর পর তাঁহারই স্বদেশীয় উইলবার রাইট্ পুনরায় উড়িবার কলের পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। উড়িবার সময় একবার কল থামিয়া যাওয়াতে আকাশ হইতে পতিত হইয়া রাইটের একখানা পা ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতেও ভীত না হইয়া রাইট্ পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন এবং সেই চেষ্টার ফলে মানুষ আজ গগনবিহারী হইয়া নীলাকাশে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

## অনুশীলনী

১। "কোন চেষ্টাই একেবারে বিফল হয় না"—এই কথা দ্বারা লেখক কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন ?

২। জ্ঞানরাজ্যের সঙ্গে লেখক প্রবালদ্বীপের তুলনা করিয়াছেন কেন ?

৩। কাহাকে ব্যাঙ নাচানোর অধ্যাপক বলা হইত ? তিনি কি আবিষ্কার করিয়াছিলেন ?

৪। "পৃথিবীর ইতিহাসই যেন পরিবর্তিত হইয়াছে।" কিসে এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে ? কিভাবে কি কি পরিবর্তন হইয়াছে ?

৫। বেলুন আকাশে ওড়ার কি অসুবিধা ছিল ? কে কিভাবে এই অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা করেন ?

৬। সোয়ার্জ কে ? তিনি কোন্ দেশের লোক ? তিনি কি তৈরি করিয়াছিলেন ? তাঁহার যন্ত্রটি কিরূপ ছিল ?

৭। সোয়ার্জের মৃত্যুর পর তাঁহার নির্মিত যন্ত্রটির ভাগ্যে কি ঘটিল ? এই অভিযান সফল হইল কি ? ইহার দ্বারা কি প্রমাণিত হইল ?

৮। লিলিয়ানথাল কিসের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষার ফলে তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল ?

৯। ল্যাঙ্‌লি কে ? তিনি কিরূপ যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করেন ? ইহার ফল কি হইল ?

১০। উইলবার রাইট কে ? কিভাবে তাঁহার পা ভাঙিয়া যায় ? তাঁহার নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়া আছে কেন ?

১১। (ক) "আজ যাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে হয়, দুই দিন পরে তাহা হইতে মহৎ ফল উৎপন্ন হইতে পারে।"

উপরের অংশগুলি কোথা হইতে গৃহীত? প্রসঙ্গ নির্দেশ কর। উদ্ধৃতাংশের বক্তব্য নিজের ভাষায় বুঝাইয়া বল।

১২। প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদটি পড়। এখানে ব্যবহৃত সমাপিকা ক্রিয়াগুলির কাল নির্দেশ কর।

১৩। বিদ্যুৎ-শক্তির দ্বারা মানবসমাজ কিভাবে লাভবান হইয়াছে?

১৪। নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিকগণ কে কি লইয়া পরীক্ষা করিতেন—
গ্যালভানি, সোয়ার্জ, লিলিয়ানথাল, ল্যাঙ্গ্লি, উইলবার রাইট।

১৫। আকাশে উড়িবার চেষ্টায় প্রাণ হারাইয়াছেন এরূপ দুইজন বৈজ্ঞানিকের নাম কর। তাঁহারা কিভাবে প্রাণ হারান বল।

১৬। পদ-পরিবর্তন কর ঃ—পতিত, অসম্পূর্ণ, বিস্তার, সমর্থ, অভিপ্রায়, প্রস্তুত, নিষ্ফল, চেষ্টা, পরীক্ষা, নির্মিত।

১৭। শব্দার্থ লেখ ঃ—অধোদিকে, অবলম্বন, অনুসন্ধান, সহধর্মিণী, প্রতিকূল, অভিপ্রায়।

## মৌখিক প্রশ্ন

১। প্রবাল কি? প্রবাল দ্বীপ কিভাবে তৈরি হয়?

২। সোয়ার্জ কি করেছিলেন?

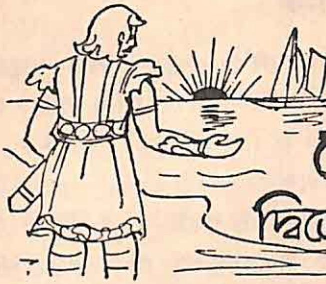
৩। ঠাট্টা করে গ্যালভানিকে কি বলা হত?

৪। পাখির মতো কে আকাশে ওড়েন?

৫। কিভাবে রাইটের পা ভেঙেছিল?

## অতিরিক্ত মন্তব্য

তিল তিল করিয়া, পদে পদে, পৃথিবীর রাজা, নীলাকাশে সাম্রাজ্য বিস্তার—এই কথাগুলির সাধারণ অর্থ ছাড়িয়ে বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণ অর্থ, বিশেষ অর্থ এবং তার প্রয়োগ ভালোভাবে লক্ষ্য কর।



# চন্দ্রগুপ্ত ও সেকেন্দার

## দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

**লেখক-পরিচয়।** নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ( ১৮৬৩-১৯১৩ ) বাংলা সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতি ও সম্মানের আসন অধিকার করিয়া আছেন। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক ও পারিবারিক সব ধরনের নাটকই তিনি লিখিয়াছেন। তবে ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রেই তাঁহার কৃতিত্ব সর্বাধিক। এছাড়া বেশ কয়েকটি সার্থক প্রহসনও তিনি লেখেন। হাসির গান রচনায়ও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। "সাজাহান", "নূরজাহান", "রাণা প্রতাপসিংহ", "মেবার পতন" প্রভৃতি তাঁহার বিশিষ্ট নাটক।

[ **রচনা-পরিচয়।** লেখকের **'চন্দ্রগুপ্ত'** নামক বিখ্যাত নাটকের গোড়ার একটু অংশ এখানে সঙ্কলিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যভাষার গাম্ভীর্য এবং আবেগ-প্রাবল্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মতো। যুবক-বয়সে বিসর্জিত রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডার বা সেকেন্দার-এর সেনাবাহিনীর নিকট হইতে গ্রীক-রণকৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন—এই প্রসঙ্গ বর্তমান দৃশ্যের অবলম্বন। ]

স্থান—সিন্ধু নদতট ; দূরে গ্রীক জাহাজশ্রেণী। কাল—সন্ধ্যা।

[ নদীতটে শিবির-সম্মুখে সেকেন্দার ও সেলুকস অস্তগামী সূর্যের দিকে চাহিয়াছিলেন। হেলেন সেলুকসের হস্ত ধরিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান। সূর্যরশ্মি তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। ]

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস! কী বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায় ; আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এ আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। এর বিশাল নদনদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম বেগে ছুটছে। এর মরুভূমি স্বেচ্ছাচারের মতো তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা করছে।

সেলুকস। সত্য সম্রাট।

সেকেন্দার। কোথাও দেখি, তালীবন গর্বভরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বিরাট বন স্নেহচ্ছায়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ; কোথাও মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গমপর্বতসম মন্থরগমনে চলেছে ; আর সবার উপরে এক সৌম্য গৌর, দীর্ঘকান্তি জাতি এই দেশ শাসন করছে। তাদের মুখে শিশুর

সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস। এ শৌর্য পরাজয় করে আনন্দ আছে। পুরুকে বন্দী করে আনি যখন—সে কি বললে জান?

সেলুকস। কী সম্রাট?

সেকেন্দার। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার কাছে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর' —সে নির্ভীক নিষ্কম্প স্বরে উত্তর দিল—'রাজার প্রতি রাজার আচরণ!' চমকিত হলাম। ভাবলাম—এ একটা জাতি বটে। আমি তৎক্ষণাৎ তাকে তার রাজ্য প্রত্যর্পণ করলাম।

সেলুকস। সম্রাট মহানুভব।

সেকেন্দার। মহানুভব! তারপরে তার সঙ্গে অন্যরূপ ব্যবহার সম্ভব? মহৎ কিছু দেখলেই একটা উল্লাস আসে। আর আমি এখানে রাজ্য স্থাপন করতে আসি নাই। আমি এসেছি শৌখীন দিগ্বিজয়ে। জগতে একটা কীর্তি রেখে যেতে চাই।

সেলুকস। তবে এ দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে যাচ্ছেন কেন সম্রাট?

সেকেন্দার। সে দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ করতে হলে নূতন গ্রীক সৈন্য চাই।—কী আশ্চর্য সেনাপতি! দূর ম্যাসিডন থেকে রাজ্য জনপদ তৃণসম পদতলে দলিত করে চলে এসেছি। ঝঞ্ঝার মতো এসে মহাশত্রুসৈন্য ধূমরাশির মতো উড়িয়ে দিয়েছি! কিন্তু বাধা পেলাম প্রথম—সেই শতদ্রুতীরে।

[ চন্দ্রগুপ্তকে ধরিয়া আণ্টিগোনাসের প্রবেশ ]

সেকেন্দার। কী সংবাদ আণ্টিগোনাস্—এ কে?

আণ্টিগোনাস্। গুপ্তচর।

সেলুকস। সে কি!

সেকেন্দার। গুপ্তচর!

আণ্টিগোনাস্। আমি দেখলাম যে এক শিবিরের পাশে বসে, নির্জনে শুষ্ক তালপত্রে কী লিখছিল। আমি দেখতে চাইলাম—পত্রখানি দেখাল। পড়তে পারলাম না।—তাই সম্রাটের কাছে নিয়ে এসেছি।

সেকেন্দার। কী লিখছিলে যুবক! সত্য বলো।

চন্দ্রগুপ্ত। সত্য বলব।—রাজাধিরাজ! ভারতবাসী মিথ্যা কথা বলতে এখনও শিখে নাই।

সেকেন্দার। ( একবার সেলুকসের প্রতি চাহিলেন, পরে চন্দ্রগুপ্তকে কহিলেন ) উত্তম। বলো কী লিখছিলে!

চন্দ্রগুপ্ত। আমি সম্রাটের বাহিনীচালনা, ব্যূহ-রচনাপ্রণালী, সামরিক নিয়ম এই সব মাসাবধিকাল ধ'রে শিখছিলাম।

সেকেন্দার। কার কাছে?

চন্দ্রগুপ্ত। এই সেনাপতির কাছে।

S.C.E.R.T., West Bengal
Date 17/2/92
Acc. No. 5170



সেকেন্দার। সত্য সেলুকস ?

সেলুকস। সত্য।

সেকেন্দার। ( চন্দ্রগুপ্তকে ) তারপর ?

চন্দ্রগুপ্ত। তারপর গ্রীক সৈন্য কাল এস্থান পরিত্যাগ করে' যাবে শুনে আমি যা শিখেছি তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম।

সেকেন্দার। কী অভিপ্রায়ে ?

চন্দ্রগুপ্ত। সেকেন্দার শাহ্‌র সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য নহে।

সেকেন্দার। তবে—

চন্দ্রগুপ্ত। তবে শুনুন সম্রাট। আমি মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত। আমার পিতার নাম মহাপদ্ম। আমার বৈমাত্রেয় ভাই নন্দ সিংহাসন অধিকার করে আমায় নির্বাসিত করেছে। আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।

সেকেন্দার। তারপর !

চন্দ্রগুপ্ত। আমি শুনলাম ম্যাসিডন-ভূপতির অদ্ভুত বিজয়বার্তা। অর্ধেক এশিয়া পদতলে দলিত করে', নদনদী গিরি দুর্বার বিক্রমে অতিক্রম করে', শুনলাম তিনি ভারতবর্ষে এসে আর্যকুলরবি পুরুকে পরাজিত করেছেন। হে সম্রাট ! আমার ইচ্ছা হ'ল যে দেখে আসি—কী সে পরাক্রম, যার ভ্রূকুটি দেখে, এশিয়া তার পদতলে লুটিয়ে পড়ে ; তাই এখানে এসে সেনাপতির কাছে শিক্ষা করছিলাম। আমার ইচ্ছা শুধু আমার রাজ্য পুনরুদ্ধার করা। এই মাত্র।

[ সেকেন্দার সেলুকসের পানে চাহিয়া রহিলেন ]

সেলুকস। আমি এরূপ বুঝি নাই। যুবকের চেহারা, কথাবার্তা আমার মিষ্ট লাগত। আমি সরলভাবে গ্রীক সামরিক প্রথা সম্বন্ধে এর সঙ্গে আলোচনা করতাম। বুঝি নাই যে এ বিশ্বাসঘাতক।

আণ্টিগোনাস্। কে বিশ্বাসঘাতক ?

সেলুকস। এই যুবক।

আণ্টিগোনাস্। এই যুবক, না তুমি ?

সেলুকস। আণ্টিগোনাস্ ! আমার বয়স না মান, পদবী মেনে চলো।

আণ্টিগোনাস্। জানি, তুমি গ্রীক সেনাপতি, তা সত্ত্বেও তুমি বিশ্বাসঘাতক।

সেলুকস। আণ্টিগোনাস্ ! ( তরবারি বাহির করিলেন )

[ আণ্টিগোনাস্ ক্ষিপ্রতর হস্তে তরবারি বাহির করিয়া সেলুকসের শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি ক্ষেপণ করিলেন। ততোধিক ক্ষিপ্রহস্তে চন্দ্রগুপ্ত নিজ তরবারি বাহির করিয়া সে আঘাত নিবারণ করিলেন। আণ্টিগোনাস্ তাঁহাকে ছাড়িয়া চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করিলেন। ]

সেকেন্দার। নিরস্ত হও।

[ সেই মুহূর্তেই আণ্টিগোনাসের তরবারি চন্দ্রগুপ্তের তরবারির আঘাতে ভূপাতিত হইল। ]

S.C.E.R.T. West Bengal Library Calcutta 25/3

সেকেন্দার। আণ্টিগোনাস্।

[ আণ্টিগোনাস্ লজ্জায় শির অবনত করিলেন। ]

সেকেন্দার। আণ্টিগোনাস্! তোমার এই ঔদ্ধত্যের জন্য তোমায় আমার সাম্রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলাম। একজন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের এতদূর স্পর্ধা!

[ আণ্টিগোনাসের প্রস্থান। ]

সেকেন্দার। আর সেলুকস! তোমার অপরাধ তত নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে স্মরণ রেখো যে, গ্রীক সম্রাটের সম্মুখে চক্ষু রক্তবর্ণ করা গ্রীক সেনাপতির শোভা পায় না,—আর যুবক!

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট!

সেকেন্দার। তোমায় যদি বন্দী করি?

চন্দ্রগুপ্ত। কী অপরাধে সম্রাট?

সেকেন্দার। আমার শিবিরে তুমি শত্রুর গুপ্তচর হয়ে প্রবেশ করেছ, এই অপরাধে।

চন্দ্রগুপ্ত। এই অপরাধে! ভেবেছিলাম যে সেকেন্দার শাহ্ বীর, দেখছি তিনি ভীরু। এক গৃহহীন নিরাশ্রয় হিন্দু রাজপুত্র হিসাবে তাঁর কাছে উপস্থিত, তাতেই তিনি ত্রস্ত। সেকেন্দার শাহ্ এত কাপুরুষ তা ভাবি নাই।

সেকেন্দার। সেলুকস! বন্দী করো।

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট! আমায় বধ না করে বন্দী করতে পারবেন না।

সেকেন্দার। ( সোল্লাসে ) চমৎকার!—যাও বীর! তোমায় বন্দী করব না। আমি পরীক্ষা করছিলাম মাত্র। নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও। আর আমি এক ভবিষ্যদ্বাণী করি, মনে রেখো! তুমি হৃতরাজ্য উদ্ধার করবে। তুমি দুর্জয় দিগ্বিজয়ী হবে—যাও বীর! মুক্ত তুমি।

## অনুশীলনী

১। সেকেন্দারের অন্য নাম কি? তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন কেন? এদেশের কি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন?

২। পুরু সম্বন্ধে সেকেন্দারের ধারণা কি? এইরূপ ধারণার কারণ কি?

৩। সেকেন্দার এদেশে কেন আসিয়াছিলেন? তিনি কি সে কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন? তিনি নিজ দেশে ফিরিয়া চলিলেন কেন?

৪। আণ্টিগোনাস্ চন্দ্রগুপ্তকে কি মনে করিয়াছিল? কেন মনে করিয়াছিল?

৫। চন্দ্রগুপ্ত কাহার কাছে গ্রীক রণবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন? কেন? তিনি কি লিখিতেছিলেন? তাঁহার আসল উদ্দেশ্য কি ছিল?

৬। আণ্টিগোনাস্ সেলুকসের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ করিয়াছিল? কেন? ইহার ফল কি হইয়াছিল?

৭। সেকেন্দার শাহ্ আণ্টিগোনাস ও সেলুকসকে কি বলিয়া ভর্ৎসনা করেন ? চন্দ্রগুপ্তের কোন্ আচরণে তিনি সন্তুষ্ট হন ? কেন হন ?

৮। সেকেন্দার শাহ্ চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে কি ভবিষ্যদ্বাণী করেন ? কেন করেন ?

৯। (ক) "আমায় বধ না করে বন্দী করতে পারবেন না।"

(খ) "আমি তৎক্ষণাৎ তাকে তার রাজ্য প্রত্যর্পণ করলাম।"

(গ) "রাজার প্রতি রাজার আচরণ।"

উপরের অংশগুলি কোন্ রচনা হইতে উদ্ধৃত ? লেখক কে ? প্রসঙ্গ নির্দেশ কর। উদ্ধৃতাংশের বক্তব্য নিজের ভাষায় বুঝাইয়া দাও।

১০। **সন্ধিবিচ্ছেদ কর**ঃ উল্লাস, দিগ্বিজয়, মাসাবধিকাল, ভবিষ্যদ্বাণী, সৈন্যাধ্যক্ষ, নিরাশ্রয়, উদ্ধার।

১১। **সমাস** ও ব্যাসবাক্য নির্ণয় কর ঃ—হৃতরাজ্য, বিশ্বাসঘাতক, রক্তবর্ণ, গুপ্তচর, গৃহহীন, রাজপুত্র, বাহিনীচালনা, মদমত্ত, দীর্ঘকান্তি।

১২। প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর ঃ—তামসী, ফেনিল, সামরিক, মুক্ত।

১৩। পদপরিবর্তন কর ঃ পরীক্ষা, নির্ভয়, ফেনিল, সামরিক, নির্বাসিত, বিশ্বাসঘাতক, মদমত্ত, অপরাধ, ত্রাস, উল্লাস, সারল্য, উপস্থিত।

১৪। সেকেন্দার, আণ্টিগোনাস্, চন্দ্রগুপ্ত—ইঁহাদের যে স্বভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে ৩-৪টি বাক্যের মধ্যে তাহা লেখ।

১৫। "যাও বীর! তোমায় বন্দী করব না।" কে কাহাকে একথা বলে ? কখন বলে, কেন বলে ? ইহার মধ্য দিয়া বক্তার স্বভাবের কি পরিচয় পাওয়া যায় ?

## মৌখিক প্রশ্ন

১। চন্দ্রগুপ্ত ও সেকেন্দার কোন্ নাটকের অংশ ?

২। নাট্যকারের নাম কি ?

৩। তাঁর লেখা আর-একটি নাটকের নাম কর।

৪। চন্দ্রগুপ্ত কোন্ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন ?

৫। সেকেন্দার কি নামে ইতিহাসে পরিচিত ?

৬। নাটকের কথাবার্তাকে কি বলে ?

## অতিরিক্ত মন্তব্য

সেকেন্দার। কী সংবাদ আণ্টিগোনাস্—এ কে ?

আণ্টিগোনাস্। গুপ্তচর।

সেলুকস। সে কি!

সেকেন্দার। গুপ্তচর!

এই-জাতীয় সংলাপই যথার্থ নাটকীয়। প্রথম গুপ্তচর শব্দটি বিবৃতি —খবর। দ্বিতীয়টি বিস্ময়ের চমক। এখানে যে চাপা উত্তেজনার ভাব প্রকাশ পেয়েছে তাতে নাট্যরস জমে উঠেছে।



# রাজদ্বারে শ্মশানে চ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

**লেখক-পরিচয়** বাঙালী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে জনপ্রিয়তায় শরৎচন্দ্র (১৮৭৬-১৯৩৮) তাঁহার সমকালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক। রবীন্দ্রনাথ হইতে তিনি বয়সে ছিলেন পনের বৎসরের ছোট এবং রবীন্দ্র-প্রতিভার বিস্ময়কর প্রকাশের পাশাপাশিই তিনি আপন শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য নিয়া বাঙালী পাঠকের চিত্তে নিজের আসন অধিকার করিয়া নিয়াছেন। পারিবারিক জীবনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার চিত্র-অঙ্কনে এবং সামাজিক জীবনের বাস্তব রূপ অঙ্কনে শরৎচন্দ্রের শক্তি ছিল অসামান্য। পরবর্তী কালের শক্তিধর ঔপন্যাসিকেরাও তাঁহার সে গৌরব ম্লান করিতে পারেন নাই। মানব-হৃদয়ের বিশ্লেষণে তাঁহার স্বাভাবিক একটি নিপুণতা ছিল। তুচ্ছ, অবহেলিত মানুষের প্রতি তাঁহার ছিল অপরিসীম মমতা। এমন কি যাহারা সমাজের চোখে অপরাধী বলিয়া বিবেচিত, শরৎচন্দ্র তাহাদের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি, শ্রদ্ধা ও সুবিচার দাবি করিয়াছেন। তাই বাঙালী পাঠকের কাছে তিনি 'দরদী কথাশিল্পী' রূপে পরিচিত।

[ **রচনা-পরিচয়**। গল্প বলার আশ্চর্য শক্তি ছিল শরৎচন্দ্রের। তিনি অতি সহজে নানা ধরনের মানুষের স্বভাব এবং হাস্য করুণা ভীতি প্রভৃতি বিভিন্ন স্বাদ ফুটাইয়া তুলিতেন তাঁহার কাহিনীতে। লালুর সাহস ও দুরন্তপনা নিয়া কয়েকটি গল্প তিনি লিখিয়াছেন। এটি তাঁহার অন্যতম।]

আমাদের শহরে তখন শীত পড়েছে, হঠাৎ কলেরা দেখা দিলে। তখনকার দিনে ওলাউঠার নামে মানুষ ভয়ে হতজ্ঞান হ'ত। কারও কলেরা হয়েছে শুনতে পেলে সে পাড়ায় মানুষ থাকত না। মারা গেলে দাহ করার লোক মেলা দুর্ঘট হত। কিন্তু সে দুর্দিনেও আমাদের ওখানে একজন ছিলেন যাঁর কখনো আপত্তি ছিল না। গোপাল খুড়ো তাঁর নাম, জীবনের ব্রত ছিল মড়া পোড়ানো। কারও অসুখ শক্ত হয়ে উঠলে তিনি ডাক্তারের কাছে প্রত্যহ সংবাদ নিতেন। আশা নেই শুনলে খালি পায়ে গামছা কাঁধে তিনি ঘণ্টা দুই পূর্বেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেন। আমরা জনকয়েক ছিলাম তাঁর চ্যালা। মুখ ভার করে বলে যেতেন, ওরে আজ রাত্রিটা একটু সতর্ক থাকিস, ডাকলে যেন সাড়া পাই। রাজদ্বারে শ্মশানে চ শাস্ত্রবাক্য মনে আছে তো?

সেদিন রাত্রি আন্দাজ আটটা। দড়ির খাটে বিছানা সমেত বিষ্টু পণ্ডিতের গৃহিণীকে আমরা ঘর থেকে উঠানে নামালাম।

গঙ্গার তীরে শ্মশান অনেক দূর, প্রায় ক্রোশ তিনেক। সেখানে পৌঁছে যখন আমরা শব নামালাম, তখন রাত দুটো। লালু খাট ছুঁয়ে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসল। কেউ কেউ যেখানে সেখানে ক্লান্তিতে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। শুক্লাদ্বাদশীর জ্যোৎস্নায় বালুময় বহুদূরবিস্তৃত শ্মশান অত্যন্ত জনহীন। গঙ্গার ওপর থেকে কনকনে উত্তরে হাওয়ায় জলে ঢেউ উঠছে, তার কোন-কোনটা লালুর পায়ের নীচে পর্যন্ত আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ছে।

সহসা ওপারে দিগন্তে একটা গাঢ় কালো মেঘ উঠে প্রবল উত্তরের হাওয়ায় হু-হু করে সেটা এপারে ছুটে আসতে লাগল। গোপাল খুড়ো সভয়ে বললেন, লক্ষণ ভালো ঠেকচে নারে—বৃষ্টি হতে পারে। এই শীতে জলে ভিজলে আর রক্ষে থাকবে না। কাছে আশ্রয় কোথাও নেই, একটা গাছ পর্যন্ত না।

দেখতে দেখতে আকাশ গেল ছেয়ে, চাঁদের আলো ডুবল অন্ধকারে, ওপার থেকে বৃষ্টিধারার সোঁ সোঁ শব্দ এল কানে, ক্রমশঃ সেটা নিকটতর হয়ে উঠল। আগাম দু-দশ ফোঁটা সকলেরই গায়ে এসে পড়ল তীরের মতো, কি-করি কি-করি ভাবতে ভাবতেই মুষলধারায় বৃষ্টি নেমে এল। মড়া রইল পড়ে, প্রাণ বাঁচাতে কে যে কোথায় ছুট দিল তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

জল থামলে ঘণ্টাখানেক পরে একে একে সবাই ফিরে এলাম। মেঘ কেটে চাঁদের আলো ফুটেছে দিনের মতো।

মণি বললে, কিন্তু লালু এখনো ফিরলো না কেন? ভয়ে বাড়ি পালাল না তো?

খুড়ো লালুর উদ্দেশ্যে রাগ করে বললেন, ওটা ঐ-রকম। যদি এতই ভয়, মড়া ছুঁয়ে বসতে গেলি কেন? আমি হলে বজ্রাঘাত হলেও মড়া ছেড়ে যেতাম না।

ছেড়ে গেলে কি হয় খুড়ো?

কি হয়? কত কি? শ্মশানভূমি কিনা!

শ্মশানে একলা বসে থাকতে আপনার ভয় করত না?

ভয়! আমার? অন্ততঃ হাজারটা মড়া পুড়িয়েচি জানিস!

শ্মশানে গোটাদুই কোদাল পড়ে ছিল, খুড়ো তার একটা তুলে নিয়ে বললেন, আমি চুলোটা কেটে ফেলি, তোরা হাতাহাতি করে কাঠগুলো নীচে নামিয়ে ফেল।

খুড়ো চুলি কাটছেন, আমরা কাঠ নামিয়ে আনছি; নবু বলল, আচ্ছা, মড়াটা ফুলে যেন দুগুণ হয়েচে, না?

খুড়ো কোন দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলেন, ফুলবে না? লেপ-কাঁথা সব জলে ভিজেচে যে!

কিন্তু তুলো তো চুপসে ছোট হয়ে যাবে খুড়ো, ফুলবে না তো !

খুড়ো রাগ করে উঠলেন—তোর ভারি বুদ্ধি। যা করচিস কর।

কাঠ বহা প্রায় শেষ হয়ে এল। নবুর দৃষ্টি ছিল বরাবর খাটের প্রতি। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে বললে—খুড়ো, মড়া যেন নড়ে উঠল।

খুড়োর হাতের কাজ শেষ হয়েছিল, কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, তোর মতো ভীরু মানুষ আমি কখনো দেখিনি নবু। তুই আসিস কেন এসব কাজে? যা—বাকি কাঠগুলো আন। আমি চিতাটা সাজিয়ে ফেলি। গাধা কোথাকার!

আবার মিনিট দুই গেল। এবার মণি হঠাৎ চমকে উঠে পাঁচ-সাত পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে সভয়ে বললে, না খুড়ো, গতিক ভালো ঠেকচে না। সত্যিই মড়াটা যেন নড়ে উঠল।

খুড়ো এবারে হাঃ হাঃ করে হেসে বললে, ছোঁড়ার দল—তোরা ভয় দেখাবি আমাকে? যে হাজারের উপর মড়া পুড়িয়েচে—তাকে?

নবু বললে, ঐ দেখুন আবার নড়চে।

খুড়ো বললে, হাঁ নড়েচে, ভূত হয়ে তোকে খাবে বলে—মুখের কথাটা শেষ হল না, অকস্মাৎ লেপ-কাঁথা জড়ানো মড়া হাঁটু গেড়ে খাটের উপরে বসে ভয়ঙ্কর বিশ্রী খোনা গলায় চেঁচিয়ে উঠল,—নাঁ নাঁ—নঁবুকে নঁয়—গোঁপালকে খাঁবো—

ওরে বাবারে! আমরা সবাই মারলাম ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। গোপাল খুড়োর সুমুখে ছিল কাঠের স্তূপ, তিনি উপরের দিকে আমাদের পিছনে ছুটতে না পেরে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়লেন গঙ্গার জলে। সেই কনকনে ঠাণ্ডা একবুক জলে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলেন—বাবা গো, গেছি গো—ভূতে খেয়ে ফেললে গো!—রাম—রাম—রাম—

এদিকে সেই ভূতও তখন মুখের ঢাকা ফেলে দিয়ে চেঁচাতে লাগল—ওরে নির্মল, ওরে মণি, ওরে নবু, পালাস না রে—আমি লালু—ফিরে আয়—ফিরে আয়—

লালুর কণ্ঠস্বর আমাদের কাছে পৌঁছল। নিজেদের নির্বুদ্ধিতায় অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে সবাই ফিরে এলাম। গোপাল খুড়ো শীতে কাঁপতে কাঁপতে ডাঙায় উঠলেন; লালু তার পায়ের ধুলো নিয়ে সলজ্জে বললে, সবাই জলের ভয়ে পালাল, কিন্তু আমি মড়া ছেড়ে যেতে পারলাম না, তাই লেপের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম।

খুড়ো বললে, বেশ করেছিলে, বাবা, খাসা বুদ্ধি করেছিলে। এখন যাও ভাল করে গঙ্গামাটি মেখে চান করো গে। এমন শয়তান ছেলে আমি আমার জন্মে দেখি নি—

## অনুশীলনী

১। বিষ্টুপণ্ডিতের গৃহিণীকে সৎকার করিতে কে কে শ্মশানে গিয়াছিল? তাহাদের নেতা কে ছিলেন?

২। শ্মশানে গিয়া শবদাহকারীরা কি বিপদে পড়িয়াছিল? এই বিপদ দেখা দিতে তাহারা কে কি করিল?

৩। শ্মশানে লালুর উপর কি দায়িত্ব ছিল? ঝড়-বৃষ্টির পরে সবাই ফিরিয়া আসিয়া লালুকে খুঁজিল কেন? এই বিষয়ে গোপাল খুড়ো কি মন্তব্য করিল?

৪। চিতা তৈরি করিবার সময় কে কিভাবে ভয় পাইল? গোপাল খুড়ো প্রথমে কিভাবে গর্ব প্রকাশ করিল? পরে সে কিভাবে ভয় পাইল?

৫। লালু কেন মৃতদেহ ছাড়িয়া যায় নাই? সে সবাইকে, বিশেষ করিয়া গোপাল খুড়োকে ভয় দেখাইল কেন? এই ঘটনার মধ্য দিয়া তাহার স্বভাবের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

৬। "ভয়! আমার? অন্তত হাজারটা মড়া পুড়িয়েচি জানিস?" এই কথা কে কাহাকে কখন বলিয়াছিল? সে কি শেষ পর্যন্ত এই সাহসের পরিচয় দিতে পারিয়াছিল?

৭। "এমন শয়তান ছেলে আমি আমার জন্মে দেখি নি—" একথা কে কাহার সম্বন্ধে কখন বলে? কথাটি কি সত্য?

৮। "নঁবুকে নঁয় গোঁপালকেঁ—" একথা কে কখন বলে? কেন বলে? এরকম চন্দ্রবিন্দু দিয়ে কথা বলার কারণ কি?

৯। বাক্য রচনা করঃ—কাঁপতে কাঁপতে, খাসা বুদ্ধি, কনকনে ঠাণ্ডা, চ্যালা, হু হু করে।

১০। সন্ধিবিচ্ছেদ করঃ—পরিস্ফুট, নির্বুদ্ধি, দুর্ঘট।

১১। পদ পরিবর্তন করঃ—পণ্ডিত, শয়তান, ভয়ঙ্কর, ভীতু, বজ্রাঘাত।

১২। অর্থ লেখঃ—পরিস্ফুট, নির্বুদ্ধি, দুর্ঘট, বজ্রাঘাত, চ্যালা, ডাঙা।

১৩। 'রাজদ্বারে শ্মশানে চ—' এই কথাগুলি কে বলিয়াছিল? কেন বলিয়াছিল?

১৪। লালু কেমন ছেলে ছিল—ভীরু না সাহসী? তাহার সাহসের কি পরিচয় এ গল্পে আছে?

১৫। বৃষ্টি আরম্ভ হইলে শ্মশানযাত্রীদের মধ্যে কে কে পালাইল? কে পালায় নাই? কেন? ইহাতে তাহার স্বভাবের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

১৬। সেকালে কারও কলেরা হইলে পাড়ার লোকেরা কি করিত? লালুদের পাড়ার কলেরা হইলে কে সাহস করিয়া আগাইয়া আসে? তাহার কি উদ্দেশ্য ছিল?

১৭। এই গল্পে যে যে চরিত্রের সঙ্গে তোমার পরিচয় হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কাহাকে তোমার বেশি ভালো লাগে ? কেন ?

১৮। গোপাল খুড়োর চরিত্র তোমার মনে কি ভাবের সৃষ্টি করে—কৌতুক, ভয়, না শ্রদ্ধা ? কেন ?

## মৌখিক প্রশ্ন

১। রাজদ্বারে শ্মশানে চ—পুরো শ্লোকটা কি ?

২। কার লেখা শ্লোক ?

৩। শ্লোকটির অর্থ কি ?

৪। কে কাকে ভয় দেখিয়েছিল ? কিসের ভয় ?

৫। সমস্ত ব্যাপারটি কোথায় ঘটেছিল ?

## অতিরিক্ত মন্তব্য

নাঁ নাঁ—নঁবুকে নঁয়—গোঁপালকে খাব—এখানে অনেকগুলো চন্দ্রবিন্দু বাড়তি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ লোকের কুসংস্কার ভূতেরা খোনা বা নাকী স্বরে কথা বলে। ভূতের ভয় দেখাবার জন্যই লালু চন্দ্রবিন্দুযুক্ত নাকী উচ্চারণ করেছে।




## যোগেশচন্দ্র বাগল

**লেখক-পরিচয়।** যোগেশচন্দ্র বাগল ( ১৯০৩-১৯৭২ ) ঐতিহাসিক ও গবেষক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি বিশিষ্ট কয়েকটি সাময়িকপত্র ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

[ **রচনা-পরিচয়।** ১৯০৫ সালে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার বঙ্গদেশকে দুই খণ্ডে ভাগ করিয়াছিল। উহার প্রতিবাদে দেশব্যাপী তুমুল গণ-আন্দোলন দেখা দিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে উহাই এদেশের প্রথম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলন। এই প্রবন্ধটিতে তাহার সামান্য পরিচয় আছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গবিরোধী সেই আন্দোলন সোনার অক্ষরে লিখিয়া রাখিবার মতো। ]

যাবার বেলা লর্ড কার্জন বাঙালীকে এমন এক আঘাত দিয়ে যান যার ফলে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল আন্দোলিত হতে থাকে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্পর্কে জল্পনা বহুদিন পূর্বেই শুরু হয়। কংগ্রেস এর প্রতিবাদে ১৯০৩ ও ১৯০৪ সালে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। লর্ড কার্জনের নির্দেশে বঙ্গের ছোটলাট নতুন প্রতিষ্ঠিত ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন বা জমিদারসভা আহ্বান ক'রে তাঁদের এর মর্ম বুঝিয়ে দিলেন। স্বয়ং পূর্ব বাংলা ভ্রমণ ক'রে জমিদার ও প্রজাদের এ সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। কিন্তু কেউই তাঁর এ প্রস্তাবে রাজি হন নি। ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ জমিদার মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী তাঁকে মুখের উপরই বলেছিলেন, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ হলে বাঙালীরা সেজন্য প্রাণপণে লড়তেও দ্বিধা করবে না। এরপর কিছুকাল সব চুপচাপ থাকে। অকস্মাৎ একদিন শোনা গেল, বঙ্গব্যবচ্ছেদ-কার্যে ভারতসচিব সম্মতি দান করেছেন। সেদিন ছিল ২০শে জুলাই ১৯০৫। রাজশাহী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ এবং বাকী অংশ—প্রেসিডেন্সি বিভাগ, বর্ধমান বিভাগ, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বাংলাদেশ নামে পরিচিত হল। তিনি বঙ্গ ভঙ্গ ক'রে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিলেন। বাঙালী জাতি রাজনীতিতে ও শিক্ষায় অগ্রসর ও সমগ্র ভারতে নেতৃস্থানীয়। এই জাতিকে পরস্পর থেকে

বিচ্ছিন্ন করতে পারলে তার নেতৃত্বক্ষমতাও ঘুচে যাবে, ভারতবাসীর প্রগতিমূলক আন্দোলনেও ভাটা পড়বে। অন্য উদ্দেশ্য ছিল আরও মারাত্মক—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদবুদ্ধির উদ্রেক। তিনি পূর্ববঙ্গ সফরকালে মুসলমানদের বুঝিয়েছিলেন, নূতন প্রদেশ গঠিত হলে পূর্ববঙ্গে তাদেরই প্রাধান্য হবে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত থাকলে সরকারে প্রতিপত্তিলাভে তাদের কোনই সুবিধা হবে না।

বঙ্গভঙ্গের বার্তা শুনে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সর্বত্র বাঙালী-প্রাণ ভীষণ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, ফলে যে আন্দোলন উপস্থিত হল বাঙলার ইতিহাসে তার তুলনা নেই। কার্জনের তীব্র কশাঘাতে বাঙালীর নিদ্রা ভেঙ্গে গেল ও সমগ্র শক্তি বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে নিয়োজিত হল। রবীন্দ্রনাথ নব পর্যায় বঙ্গদর্শনে লিখলেন ঃ

"বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, একথা আমরা কোন-মতেই স্বীকার করিব না। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনই আমরা সচেতনভাবে অনুভব করিব যে, বাঙলার পূর্ব পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পূর্ব পশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ বাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্তস্রোত সমস্ত বঙ্গদেশের শিরায় উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে। আমরা প্রশ্রয় চাহি না—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতার রুদ্র মূর্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ করিবে। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।"

কলকাতায় ও মফস্বলস্থ বিভিন্ন শহরে বাঙালীরা সভাসমিতি ক'রে প্রতিজ্ঞা করলেন, এ ব্যবস্থার প্রতিকার করতেই হবে। কিন্তু হীনবল জাতির পক্ষে কি উপায় অবলম্বন সম্ভব। স্বদেশী যুগের অন্যতম প্রধান নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় দেশের জনসাধারণকে একটি উপায় এইরূপ বাতলে দিলেন। তারা যেন সকলে প্রতিজ্ঞা করে—"আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা অতঃপর দেশজাত দ্রব্য পাইলে কোনও বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিব না। এই কার্য করিতে যদি কোন আর্থিক বা অন্য কোনও প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আমরা করিতে প্রস্তুত হইব। আমরা এরূপ কার্য কেবল নিজেরাই করিয়া ক্ষান্ত হইব না, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য লোকদিগকেও এইরূপ করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের শুভ সঙ্কল্পে সহায় হউন।"

তড়িৎ-গতিতেই এই বাণী বাংলার দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হল। জনগণ সভাসমিতি ক'রে বিলাতী দ্রব্য 'বয়কট' বা বর্জনের সংকল্প গ্রহণ করলেন।

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ স্বদেশভক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা"য় লিখলেন, "মা লক্ষ্মী, কৃপা কর, কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেবো না। ঘরের থাকতে পরের নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাবো। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক, মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুক।"

সরকার ঘোষণা করলেন, ১৯০৫, ১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদকার্য সমাধা হবে। অমনি দিকে দিকে এই দিনটিকে ক্ষোভ ও দুঃখের প্রতীক করে তোলবার জন্য নেতৃবর্গ আয়োজন শুরু করলেন। এই দিনটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বঙ্গের মিলনের চিহ্নস্বরূপ 'রাখীবন্ধন' ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ক্ষোভ প্রকাশের জন্য 'অরন্ধন' পালন করবার প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাব সাগ্রহে গৃহীত হল।

এই কার্যক্রম কলকাতার বাঙালীসমাজ নীরবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। সেদিন সর্বত্র হরতাল—কাজকর্ম, গাড়ি চলাচল সবই বন্ধ। 'রাখীবন্ধন'-এর মিলন-মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ-রচিত এই 'রাখী-সঙ্গীতে' সহস্র কণ্ঠে গীত হ'ল—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক্ পুণ্য হউক্
পুণ্য হউক্ হে ভগবান—

### অনুশীলনী

১। লর্ড কার্জন কে ছিলেন? তিনি যাইবার বেলা বাঙালীকে কি আঘাত দিয়া যান?

২। এই প্রবন্ধে এমন দুইটি বিভাগের কথা আছে যাহা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গেও আছে। সেই বিভাগ দুইটির নাম বল। কি কি জেলা লইয়া ঐ বিভাগ দুইটি গঠিত?

৩। বঙ্গভঙ্গের কথা কোন্ দিন ঘোষণা করা হইল? কোন্ দিন হইতে উহা কার্যে পরিণত হওয়ার কথা ছিল?

৪। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে কি প্রস্তাব দিয়াছিলেন? এই উপলক্ষে তিনি কি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন?

৫। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কে? উনি বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে কি প্রস্তাব দিয়াছিলেন? তাঁহার কোন্ গ্রন্থে তিনি ইহার প্রতিবাদে লিখিয়াছিলেন?

৬। "আমরা প্রশ্রয় চাহি না…সুভিক্ষা নহে।"—কাহার রচনা হইতে উদ্ধৃত? প্রসঙ্গ নির্দেশ কর। বক্তব্য বুঝাইয়া দাও।

৭। বঙ্গভঙ্গ কি? কোন্ ইংরেজ শাসকের চেষ্টায় এই ব্যাপার ঘটে? কোন্ তারিখে বঙ্গভঙ্গ হইয়াছিল?

৮। রাখীবন্ধন, অরন্ধন বলিতে কি বুঝা যায়? কোন্ দুইজন বাঙালী মনীষীর নাম ইহার সঙ্গে জড়িত?

৯। 'রাখীবন্ধন' উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের লেখা গানের চারটি চরণ উদ্ধৃত কর।

১০। কি কি উদ্দেশ্য নিয়া ইংরেজ শাসকেরা বঙ্গভঙ্গ করিয়াছিল?

১১। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ—রাখীবন্ধন, অরন্ধন, বঙ্গদর্শন, সঞ্জীবনী, বয়কট।

১২। শব্দার্থ লেখ :—অঙ্গচ্ছেদ, পড়শী, মাতৃভূমি, হরতাল, প্রগতিমূলক, সঙ্কল্প, কশাঘাত।

## মৌখিক প্রশ্ন

১। বাংলার মাটি বাংলার জল—কার লেখা?

২। বঙ্গভঙ্গ কবে হয়েছিল?

৩। 'অরন্ধন' প্রস্তাব কার?

৪। 'রাখীবন্ধন'-এর প্রস্তাব কে দিয়েছিলেন?

৫। 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' কার লেখা?

## অতিরিক্ত মন্তব্য

এক ঢিলে দুই পাখি মারা, কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেওয়া, মোটা অন্ন, মোটা বস্ত্র, ঘরের লক্ষ্মী—এগুলি বিশিষ্ট অর্থবোধক বাক্যাংশ। সাধারণ অর্থে নয়, একটি তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে এদের প্রয়োগ হয়।




**লেখক-পরিচয়।** তারাশঙ্কর ( ১৮৯৮-১৯৭১ ) বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'কবি' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ। তাঁহার রচনায় বাস্তবতার রূঢ় রুক্ষ মূর্তি জীবন্ত হইয়া আছে। বহু বিচিত্র সাধারণ মানুষের চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল।

[ **রচনা-পরিচয়।** তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাস 'ধাত্রীদেবতা'র প্রথম দিকের এক অংশ এখানে সঙ্কলিত হইয়াছে। ঐ উপন্যাসের নায়ক শিবনাথের বালক বয়সের এই খেলা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি ইঙ্গিত করে। তাহার এই আচরণ আবার সব বালকের অভিজ্ঞতার বিষয়। রচনাটি বিশেষভাবে কৌতূহল উদ্রেক করে। ]

বাংলাদেশের কৃষ্ণাভ কোমল উর্বর ভূমি-প্রকৃতি বর্তমান বেহারের প্রান্তভাগে আসিয়া অকস্মাৎ রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। রাজ-রাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা ষড়ৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া যেন ভৈরবীবেশে তপশ্চর্যায় মগ্ন। অসমতল গৈরিকবর্ণের প্রান্তর তরঙ্গায়িত ভঙ্গিতে দিগন্তের নীলের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; মধ্যে মধ্যে বনফুল আর খৈরিকাটার গুল্ম; বড় গাছের মধ্যে দীর্ঘ তালগাছ তপস্বিনীর শীর্ণ বাহুর মতো ঊর্ধ্বলোকে প্রসারিত। বীরভূমের দক্ষিণাংশের বক্রেশ্বর ও কোপাই—দুইটি নদী মিলিত হইয়া কুয়ে নাম লইয়া মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়া ময়ূরাক্ষীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

এই কুয়ের পলিমাটির সুবিধা গ্রহণ করিয়াই লাঘাটা বন্দরের বাড়ুজ্জে-বাড়ির সাত-আনির মালিক কৃষ্ণদাসবাবু দেবীবাগ নামে শখের বাগানখানা তৈয়ারি করিয়াছিলেন। নানাপ্রকার ফল ও ফুলের গাছগুলি পরিচর্যায় ও চরভূমির উর্বরতায় সতেজ পুষ্টিতে বেশ ঘন হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাগানের মধ্যে একটি পাকা কালীমন্দির, একটি মেটে দুই-কুঠুরি বাংলো-ঘর, একখানি রান্নাঘর; মধ্যে মধ্যে ছায়াঘন গাছের তলায় বসিবার জন্য পাকা আসনও কৃষ্ণদাসবাবু তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে গ্রাম হইতে এতদূরে, এই নির্জনে বাগানের শোভা ও সুখ উপভোগ করিবার মতো বয়স্ক

উত্তরাধিকারীর অভাবেও বাগানখানা ম্লান নিস্তেজ হয় নাই, বরং বেশ একটু বন্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবুও চারিদিকের গৈরিক অনুর্বর রুক্ষ প্রকৃতির মধ্যে বাগানখানির শ্যামশোভায় চোখ জুড়াইয়া যায়।

বাগানের মধ্যে কালীবাড়ির পাকা বারান্দায় বসিয়া কৃষ্ণদাসবাবুর পুত্র শিবনাথ একটা ধনুকে জ্যা-রোপণ করিয়া একটা টান দিয়া ধনুকটার সামর্থ্য পরীক্ষা করিতেছিল। অনতিদূরে মন্দিরের উঠানে তাহাদের রাখাল শম্ভু বাউরি বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। প্রভু এবং ভৃত্য দুইজনেই বালক, বয়স তেরো-চৌদ্দের বেশী নয়। একপাশে খান দুই ছোট বাঁশের লাঠি ও কতকগুলো পাথর জমা করা রহিয়াছে। এগুলি তাহার যুদ্ধের সরঞ্জাম। গ্রামের অপর পাড়ার ছেলেদের সহিত সে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। পূজার সময় হইতেই দুই পাড়ার কিশোর-রাষ্ট্রের মধ্যে অসন্তোষ এবং বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল। দুই পাড়ার প্রতিমার শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া তর্ক হইতে এ বিরোধের সূত্রপাত। দুই পাড়ার প্রতিমাই অবশ্য একই কারিগরের গড়া, তবুও তো তাহার ভালমন্দ আছে! এ বিষয়ে কোন মীমাংসা না হওয়ায় ও-পাড়ার ছেলেরা দাবি করিয়াছিল, তাহাদের প্রতিমা অধিক জাগ্রত। সে বিষয়ে শিবনাথের পাড়ার পরাজয় হইয়াছে, কারণ ও-পাড়ার মানসিক বলিদান হয় বাহান্নটি আর তাহার পাড়ায় মাত্র আটটি। এই শোচনীয় পরাজয়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ও-পাড়ার ছেলেদের ফুটবল-ম্যাচে চ্যালেঞ্জ করিয়াছিল। ম্যাচে শিবনাথের পাড়া জিতিল, কিন্তু সেই হইল যুদ্ধের সূত্রপাত। ম্যাচ হারিয়া ও-পাড়ার ছেলেরা শিবনাথের দলের একটি ছেলের মাথা ফাটাইয়া দিল। শিবনাথ ও-পাড়ার দলপতির কাছে চরমপত্র পাঠাইল—যদি অবিলম্বে অন্যায়-আঘাতকারিগণ ক্ষমা প্রার্থনা না করে, তবে তাহারাও ইহার প্রতিশোধ লইবে।

তাহার পরেই খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল, ও-পাড়ার ছেলেরা এ-পাড়ায় আসিলেই ইহারা বন্দী করিবার চেষ্টা করে। বন্দিত্ব স্বীকার না করিলে যুদ্ধ শুরু হয়। এ-পাড়ার ছেলেরা ও-পাড়ায় গেলে বেশ ঘা কতক খাইয়া বাড়ি ফেরে। শেষ পর্যন্ত শিবনাথ শক্তির চরম পরীক্ষার জন্য বিপক্ষকে প্রকাশ্য যুদ্ধে আহ্বান করিল। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে রণাঙ্গন নির্দিষ্ট হইয়াছে ওই গৈরিক প্রান্তরে। বালকমনের চাপল্য এবং খেয়ালের অন্তরালে শিবনাথের মনে আরও একটা বস্তু ছিল—সেটা তাহার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। ইহারই মধ্যে স্কুলপাঠ্য পুস্তক ছাড়াও সে আরও অনেক বই পড়িয়া ফেলিয়াছে। অসমতল রণক্ষেত্রের কথা মনে হইতেই তাহার রাজসিংহের কথা মনে পড়িয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' সে পড়িয়াছে। ওই অসমতল খোয়াইগুলিও তো ঠিক পার্বত্য পথের মতো। সে অবিলম্বে মনে মনে রাজসিংহের পদ্ধতিতে আপন সৈন্য-সমাবেশ-পদ্ধতি ছকিয়া লইল এবং

কয়েকজন বন্ধুকে লইয়া বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া নিপুণ সেনাপতির মতোই সৈন্য-সমাবেশ করিল। পথের দুই পাশের অদূরবর্তী খোয়াইয়ের মধ্যে তাহার দলস্থ ছেলেদের লুকাইয়া রাখিল। কিছু দূরে সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে জনকয়েককে লইয়া সে যেন শত্রুপক্ষের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। ফলও হইল আশানুরূপ, শত্রুপক্ষীয়েরা শিবনাথকে ক্ষীণবল দেখিয়া হৈ-হৈ করিয়া তাহাদের সমীপবর্তী হইবামাত্র পশ্চাতের লুক্কায়িত দল আত্মপ্রকাশ করিয়া পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে শিবনাথের জয় হইয়া গেল, শত্রুপক্ষ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। শিবনাথ শুধু অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগের কথাই ভাবিয়াছিল, দুই পাশের পথ অবরোধের কথা ভাবে নাই। সেই পথ দিয়া শত্রুরা যে যেমন পারিল পলায়ন করিল। বন্দী হইল জন-কয়েক, জনকয়েক পলায়নপথে কাঁকরে পা হড়কাইয়া পড়িয়া আহত হইল, বাকি দলের পশ্চাতে শিবনাথের দল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অনুসরণ করিল। বন্দী যাহারা হইয়াছিল, শিবনাথ তাহাদের সহিত মন্দ ব্যবহার করিল না, সসম্মানে সকলের সহিত সন্ধি করিয়া আপনার বাগানের কিছু ফল উপহার দিয়া বিদায় করিল। তাহাদের সহিত শিবনাথের বা তাহাদের পাড়ার আর কোন বিরোধ নাই। শিবনাথ স্বীকার করিয়াছে তাহাদের পাড়ার ঠাকুর শ্রেষ্ঠ, তাহারা স্বীকার করিয়াছে, শিবনাথের পাড়ার ফুটবল টীম শ্রেষ্ঠ এবং শিবনাথ শ্রেষ্ঠ। এখন শিবনাথ বসিয়া আছে বিপক্ষ দলের দলপতির প্রতীক্ষায়। কিন্তু অনুসরণকারীরা এখনও কেহ ফেরে নাই। শিবনাথ সংকল্প করিয়াছে দলপতির সহিতও বন্দী পুরুরাজের মতোই ব্যবহার করিবে। কিন্তু তাহার মন্ত্রী ও সেনাপতি—সেই পা-বাঁকা কানাই আর রজনীকে, তাহাদের দন্তে তৃণ ধরাইয়া ছাড়িবে।

শম্ভু বলিল, ওরা আর আসবে না বাবু। বাড়ি চলে গিয়েছে সব। খিদে নেগেছে, আর সব যে যার বাড়ি গিয়েছে।

মীমাংসাটা শিবনাথের মনঃপূত হইল না, যুদ্ধ করিতে আসিয়া ক্ষুধার তাড়নায় সৈন্যসামন্তেরা বাড়ি চলিয়া যাইবে কি!

শিবনাথ হতাশ হইয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

### অনুশীলনী

১। বীরভূমের ভূ-প্রকৃতি কিরূপ?

২। দেবীবাগ কি? ইহার রূপের বিবরণ দাও। কে ইহা নির্মাণ করেন? ইহার বর্তমান অবস্থা কিরূপ? কেন এইরূপ অবস্থা?

৩। শিবনাথ কাহার পুত্র? কাহাকে সঙ্গে লইয়া কোথায় বসিয়া তাহারা কিসের আয়োজন করিতেছিল?

৪। এখানে কোন্ যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে? এই যুদ্ধের প্রকৃত এবং সাময়িক কারণ কি কি? কিভাবে দুইদলে যুদ্ধ ও বিবাদ চলিতেছিল?

৫। শিবনাথ কোথায় কিভাবে সৈন্যসমাবেশ করিল? কোথা হইতে সে এই কৌশল শিখিয়াছিল?

৬। আজিকার যুদ্ধে কাহার জয় হইল? কিভাবে? যুদ্ধের ফলাফল কি হইল?

৭। শিবনাথের কোন্ বাসনা পরিতৃপ্ত হইল না? কেন?

৮। (ক) সে অবিলম্বে মনে মনে⋯সৈন্য সমাবেশ করিল।

(খ) শিবনাথ সংকল্প করিয়াছে⋯ব্যবহার করিবে।

(গ) খিদে নেগেছে, আর সব যে যার বাড়ি গিয়েছে।

—উপরের প্রতিটি অংশ কাহার লেখা কোন্ রচনা হইতে গৃহীত? প্রসঙ্গ নির্দেশ কর। উদ্ধৃতির বক্তব্য বুঝাইয়া দাও।

৯। সন্ধিবিচ্ছেদ কর—রূপান্তর, দিগন্ত, উত্তরাধিকারী, পরীক্ষা, ষড়ৈশ্বর্য।

১০। লিঙ্গান্তর কর—তপস্বিনী, রাজেশ্বরী, উত্তরাধিকারী, বন্দী।

১১। প্রথম অনুচ্ছেদের ক্রিয়াপদগুলির কাল নির্ণয় কর।

১২। ব্যাসবাক্য নির্ণয় কর—কৃষ্ণাভ, ময়ূরাক্ষী, অকালমৃত্যু, কিশোর-রাষ্ট্র।

১৩। কুয়ে বলিতে কি বোঝায়? কুয়েতে কে বাগান তৈরি করেন? এই বাগানের নাম কি? ইহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

১৪। "দলপতির সহিতও বন্দী পুরুরাজের মতোই ব্যবহার করিবে।" বন্দী পুরুরাজের সহিত কে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল? এখানে কে কাহার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিবার কথা ভাবিয়াছে?

১৫। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' কি? উহা শিবনাথের উপরে কিরূপ প্রভাব ফেলিয়াছিল?

### মৌখিক প্রশ্ন

১। কাদের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছিল? এটা কি সত্যিকারের যুদ্ধ?

২। রাজসিংহ কার লেখা?

৩। বন্দী পুরুরাজের ব্যাপারটা কি?

৪। কুয়ে কি?

৫। এই গল্প থেকে তিনটি নদীর নাম কর।

৬। এই গল্পটি কার লেখা? কোন্ উপন্যাসের অংশ?

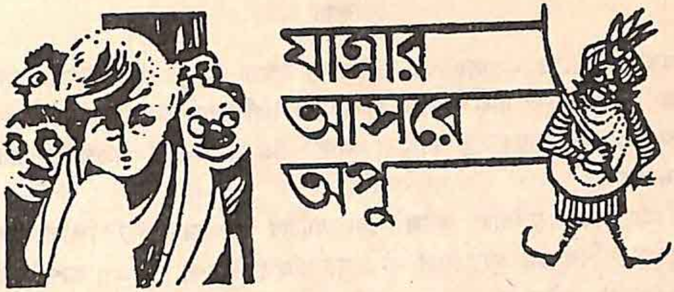
### অতিরিক্ত মন্তব্য

'রাজ-রাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা ষড়ৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া যেন ভৈরবীবেশে তপশ্চর্যায় মগ্ন।'

'দীর্ঘ তালগাছ তপস্বিনীর শীর্ণ বাহুর মতো ঊর্ধ্বলোকে প্রসারিত।'

—বর্ণনার ভাষায় এখানে 'অলঙ্কার' ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে যে তুলনার ভাব আছে—তা বুঝে নাও।

# যাত্রার আসরে অপু



—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

**লেখক-পরিচয়** ঃ বিভূতিভূষণ ( ১৮৯৪-১৯৫০ ) আধুনিক কালের মানুষ হইয়াও গ্রামজীবনের প্রতি, পল্লীপ্রকৃতির প্রতি চিরজীবন এক আশ্চর্য রহস্যময় আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন এবং তার ফলে বাংলা উপন্যাসে একটি নূতন রস পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার সুরেলা লাবণ্যদীপ্ত গদ্যভাষাও তাঁহার রচনাকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। "পথের পাঁচালী", "অপরাজিত", "আরণ্যক" প্রভৃতি ইঁহার শ্রেষ্ঠ লেখা। বিভূতিভূষণ অল্প কিছুকাল জমিদারি এস্টেটে চাকুরি করিয়াছেন, বাকি জীবন পল্লীগ্রামে শিক্ষকতা করিয়াছেন।

[ **রচনা-পরিচয়**। বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' হইতে এই রচনাটি গ্রহণ করা হইয়াছে। বালক অপুর যাত্রাপালা দেখার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ইহার বর্ণনীয় বিষয়। অপুর মনোভাবের মধ্যে প্রতিটি পাঠক যেন নিজের বাল্যকালকে ফিরিয়া পায়। ]

বারোয়ারী তলায় ঘাস চাঁচিয়া প্রকাণ্ড বাঁশের মেরাপ বাঁধিয়া সামিয়ানা টাঙানো হইয়াছে। যাত্রার দল আসে আসে—এখনও পৌঁছে নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, লোকে বলে কাল সকালের গাড়িতে আসিবে, সকাল চলিয়া গেলে বৈকালের আশায় থাকে। অপুর স্নানাহার বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। রাত্রে অপুর ঘুম হয় না, বাঁধভাঙা বন্যার স্রোতের মতো কৌতূহল ও খুশির যে কি প্রবল অদম্য উচ্ছ্বাস! বিছানায় ছটফট এপাশ-ওপাশ করে। যাত্রা হবে! যাত্রা হবে! যাত্রা হবে!

কুমারপাড়ার মোড়ে দুপুরের পর হইতেই সকল ছেলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর দূরে একখানা গোরুর গাড়ি তাহার চোখে পড়িল। সাজের বাক্স বোঝাই গাড়ি এক, দুই, তিন, চার, পাঁচখানা। পটু একে একে আঙুল দিয়া গুনিয়া খুশির সুরে বলিল—অপুদা, আমরা এদের পেছুনে পেছনে এদের বাসায় গিয়ে দেখে আসি, যাবি? সাজের গাড়িগুলোর পিছনে দলের লোকেরা যাইতেছে, সকলের মাথায় টেরিকাটা, অনেকের জুতো হাতে। পটু একজন দাড়িওয়ালা লোককে দেখাইয়া কহিল—এ বোধহয় রাজা সাজে, না অপুদা?

আকাশ-বাতাসের রং একেবারে বদলাইয়া গেল—অপু মহা উৎসাহে বাড়ি ফিরিয়া দেখে তাহার বাবা দাওয়ায় বসিয়া কি লিখিতেছে ও গুনগুন করিয়া গান করিতেছে। সে উৎসাহে হাত নাড়িয়া বলে—সাজ একেবারে পাঁচগাড়ি বাবা! এ রকম দল!—

হরিহর শিষ্যবাড়ি বিলি করার জন্য বালির কাগজে কবচ লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলে—কিসের সাজ রে খোকা? অপু আশ্চর্য হইয়া যায়, এত বড় ঘটনা বাবার জানা নাই! বাবাকে সে নিতান্ত কৃপার পাত্র বিবেচনা করে।

সকালে উঠিয়া অপুকে পড়িতে বসিতে হয়। খানিক পরে সে কাঁদোকাঁদো ভাবে বলে—আমি বারোয়ারীতলায় যাব বাবা, সকলে যাবে আর আমি এখন বুঝি বসে বসে পড়বো? এখ্‌খুনি যদি যাত্রা আরম্ভ হয়? তাহার বাবা বলে—পড়ো পড়ো, এখন বসে পড়ো, যাত্রা আরম্ভ হলে ঢোল বাজনার শব্দ তো শুনতে পাওয়া যাবে। তখন না হয় যেও এখন।

বারোয়ারীতলায় যাইবার সময় দুর্গা পিছন হইতে তাহাকে ডাকিল—শোন্ অপু! পরে সে কাছে আসিয়া হাসিহাসি মুখে কহিল—হাত পাত দিকি! অপু হাত পাতিতেই দুর্গা তাহার হাতে দুটা পয়সা রাখিয়াই তাহার হাতটা নিজের দুহাতের মধ্যে লইয়া মুঠা পাকাইয়া বলিল—দু'পয়সার মুড়কি কিনে খাস; নয়তো যদি নিচু বিক্রি হয় তো কিনে খাস। ইহার দিন সাতেক পূর্বে একদিন অপু আসিয়া চুপিচুপি দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তোর পুতুলের বাক্সে পয়সা আছে? একটা দিবি? দুর্গা বলিয়াছিল—কি হবে পয়সা তোর? অপু দিদির মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল—নিচু খাব—কথা শেষ করিয়া সে পুনরায় লজ্জার হাসি হাসিল। কৈফিয়তের সুরে বলে—বোষ্টমদের বাগানে ওরা মাচা বেঁধেচে, দিদি, ওরা অনেক নিচু পেড়েচে, দুঝুড়ি-ই-ই—এক পয়সায় ছটা, এই এত বড় বড়, একেবারে সিঁদুরের মতো রাঙা! দুর্গার পুতুলের বাক্সে সেদিন কিছুই ছিল না, সে কিছু দিতে পারে নাই। অপুকে বিরসমুখে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সেদিন তাহার খুব কষ্ট হইয়াছিল, তাই কাল বৈকালে সে বাবার কাছে পয়সা দুটা চড়ক দেখিবার ভান করিয়া চাহিয়া লয়। সোনার ভাঁটার মতো ভাইটা, মুখের আবদার না রাখিতে পারিলে দুর্গার ভারী মন কেমন করে।

যাত্রা আরম্ভ হয়। জগৎ নাই, কেহ নাই—শুধু অপু আছে আর নীলমণি হাজরার যাত্রার দল আছে সামনে। সন্ধ্যার আগে বেহালায় ইমন আলাপ করে। ভালো বেহালাদার, পাড়াগাঁর ছেলে কখনও সে ভালো জিনিস শোনে না—উদাস-করুণ সুরে হঠাৎ মন কেমন করিয়া উঠে—মনে হয় বাবা এখনও বসিয়া বাড়িতে সেই কি লিখিতেছে—দিদি আসিতে চাহিয়াও আসিতে পারে নাই। প্রথম যখন জরির সাজ-পোশাক পরিয়া টাঙানো ঝাড় ও কড়ির

ডুমের আলোসজ্জিত আসরে রাজার মন্ত্রীর দল আসিতে আরম্ভ করে, অপু মনে ভাবে এমন সব জিনিস তাহার বাবা দেখিল না! সবাই তো আসরে আসিয়াছে গ্রামের, তাহাদের পাড়ার কোনও লোক তো বাকী নাই! বাবা কেন এখনো··· ? পালা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। সেবার সে বালক-কীর্তনের যাত্রা শুনিয়াছিল—সে কি, আর এ কি! কি সব সাজ! কি সব চেহারা!

হঠাৎ পিছন হইতে কে বলে—খোকা, বেশ দেখতে পাচ্চ তো ? তাহার বাবা কখন আসিয়া আসরে বসিয়াছে অপু জানিতে পারে নাই। বাবার দিকে ফিরিয়া বলে—বাবা, দিদি এসেচে ? চিকের মধ্যে বুঝি ?

মন্ত্রীর গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যখন রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া বনে চলিতেছেন তখন কাঁদুনে সুরে বেহালায় সঙ্গত হয়। তারপর রাজা করুণ রস বহুক্ষণ জমাইয়া রাখিবার জন্য স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া এক-এক পা করিয়া থামেন, আর এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন, সত্যিকার জগতে কোন বনবাস-গমনোদ্যত রাজা নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ না হইলে একদল লোকের সম্মুখে সেরূপ করে না। বিশ্বস্ত রাজ-সেনাপতি রাগে এমন কাঁপেন যে মৃগীরোগগ্রস্ত রোগীর পক্ষেও তাহা হিংসার বিষয় হইবার কথা। অপু অপলক চোখে চাহিয়া বসিয়া থাকে, মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া যায় ; এমন তো সে কখনো দেখে নাই!

তারপর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন রাজা, কোথায় গিয়াছেন রানী! ঘন নিবিড় বনে শুধু রাজপুত্র অজয় ও কুমারী ইন্দুলেখা ভাইবোনে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেউ নাই যে তাহাদের মুখের দিকে চায়, কেউ নাই যে নির্জন বনে তাহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলে। ছোট ভাইয়ের জন্য ফল আনিতে একটু দূরে চলিয়া যাইয়া ইন্দুলেখা আর ফেরে না! অজয় বনের মধ্যে বোনকে খুঁজিয়া বেড়ায়—তাহার পর নদীর ধারে হঠাৎ খুঁজিয়া পায় ইন্দুলেখার মৃতদেহ—ক্ষুধার তাড়নায় বিষফল খাইয়া সে মরিয়াছে। অজয়ের করুণ গান—কোথা ছেড়ে গেলি এ বনকান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাথীরে—শুনিয়া অপু এতক্ষণ মুগ্ধ চোখে চাহিয়া ছিল—আর থাকিতে পারে না, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে।

কলিঙ্গরাজের সহিত বিচিত্রকেতুর যুদ্ধে তলোয়ার খেলা কী! যায়, বুঝি ঝাড়গুলা গুঁড়া হয়, নয় তো কোন হতভাগ্য দর্শকের চোখ দুটি বা যায়! রব ওঠে—ঝাড় সামলে—ঝাড় সামলে। কিন্তু অদ্ভুত যুদ্ধকৌশল—সব বাঁচাইয়া চলে—ধন্য বিচিত্রকেতু!

শেষ রাত্রে যাত্রা ভাঙিলে অপু বাড়ি আসে। পথে আসিতে আসিতে যে যেখানে কথা বলে, তাহার মনে হয় যাত্রার এক্‌টো হইতেছে। অপুর তো রাত্রে ঘুমের ঘোরে চারিধারে যেন বেহালা-সঙ্গীত হয়। ভোর হইলে একটু

বেলায় তাহার ঘুম ভাঙে—শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছে, তৃপ্তির সঙ্গে ঘুম হয় নাই, সূর্যের তীক্ষ্ণ আলোয় চোখে যেন সুঁচ বিঁধে। চোখে জল দিলে জ্বালা করে। কিন্তু তাহার কানে একটা, বেহালা-ঢোল-মন্দিরার ঐকতান বাজনা তখনও যেন বাজিতেছে—তখনও যেন সে যাত্রার আসরেই বসিয়া আছে।

## অনুশীলনী

১। অপুদের গ্রামে যাত্রার জন্য কিরূপ আয়োজন হইয়াছিল? যাত্রা হইবে এই খবর পাইয়া অপুর মনের অবস্থা কিরূপ হইল?

২। গ্রামে যাত্রার দলের আগমনের বর্ণনা দাও। অপু তখন কি করিল?

৩। পটু, হরিহর এবং দুর্গার সঙ্গে অপুর সম্পর্ক কি?

৪। যাত্রার দিনে সকালবেলা অপু বাবার কাছে কিসের বায়না করিল? বাবা তাহার বায়না রক্ষা করিলেন কি?

৫। যাত্রা আরম্ভ হইলে অপুর মনের অবস্থা কিরূপ হইল? দিদি এবং বাবার সম্পর্কে সে কি ভাবিল? বাবাকে দেখিয়া সে কি বলিল?

৬। যাত্রার কোন্ ব্যাপার দেখিয়া অপু মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া গেল? কোন্ ঘটনা দেখিয়া সে কাঁদিল? যাত্রার যুদ্ধের কি বর্ণনা এই গল্পে পাওয়া যায়?

৭। যাত্রার পরের দিন অপুর মনের অবস্থা কি হইয়াছিল?

৮। "আর থাকিতে পারে না, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে।"—কাহার কথা এখানে বলা হইয়াছে? কোন্ রচনায় এই অংশটুকু আছে? কোন্ অবস্থায় সে কাঁদিয়াছিল?

৯। "তখনও যেন সে যাত্রার আসরেই বসিয়া আছে।"—কাহার কথা বলা হইয়াছে? তাহার এই মানসিক অবস্থা হইল কেন?

১০। সমাস কি বল এবং ব্যাসবাক্য নির্ণয় কর ঃ—বাঁধভাঙা, স্নানাহার, আকাশ-বাতাসের মৃগীরোগগ্রস্ত, সাজ-পোশাক, উদাস-করুণ, বনবাসগমনোদ্যত, রাজ্যচ্যুত।

১১। পদপরিবর্তন কর ঃ—কৌতূহল, তীক্ষ্ণ, তৃপ্তি, মুগ্ধ, বিস্মিত, আলো-সজ্জিত, দ্রুত, লজ্জা, ঐকতান, কাঁদুনে।

১২। ১১নং প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখ।

১৩। যাত্রার দিনে অপুকে দুর্গা কি দিয়াছিল? কেন? কোন্ ঘটনা দুর্গার মনে পড়িয়াছিল?

১৪। যাত্রাপালার রাজা-রানীর রাজ্যত্যাগের দৃশ্যটি কেমন? উহা দেখিয়া অপুর কি মনে হইল?

১৫। অজয়, ইন্দুলেখা কে? তাহাদের কি হইয়াছিল? তাহাদের ঘটনায় অপুর মনের অবস্থা কিরূপ হইল?

## মৌখিক প্রশ্ন

১। এই গল্পটি কোন্ উপন্যাস থেকে নেওয়া ? লেখক কে ?
২। এ গল্পের নায়ক কে ? তার বাবা ও দিদির নাম কি ?
৩। গ্রামে যে যাত্রার দল এসেছিল তার অধিকারী কে ?
৪। যাত্রাপালার দুটি প্রধান চরিত্রের নাম বল।

## অতিরিক্ত মন্তব্য

"তারপর রাজা করুণ রস বহুক্ষণ জমাইয়া···বিষণ্ণ হইবার কথা।"
—লেখকের ভাষায় ঠাট্টামিশ্রিত কৌতুকরস আছে। কিন্তু অপুর কাছে সবটাই সত্য—যেন একটা কল্পনার জগৎ তার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। লেখক দুটি বিপরীত ভাব ও মেজাজকে চমৎকার মিশিয়েছেন।

# নীলবিদ্রোহ

## শিবনাথ শাস্ত্রী



**লেখক-পরিচয়।** শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) বাংলাদেশের ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও সমাজসংস্কারের একজন নেতা ছিলেন। তিনি সমকালের ইতিহাস সম্বন্ধে বই লিখিয়াছেন, কয়েকটি উপন্যাসও লিখিয়াছেন।

[**রচনা-পরিচয়।** বাংলাদেশের কৃষকেরা নীলকর সাহেবের অমানুষিক অত্যাচারে ১৮৫৮-৬০ সালে বিদ্রোহ করিয়াছিল। সেই অমর কাহিনী শিবনাথ শাস্ত্রীর বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়। ]

বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই যশোহর, নদীয়া, পাবনা প্রভৃতি নানা জেলাতে নীলের চাষ আরম্ভ হয়। ইংরাজগণ কোম্পানি করিয়া নীলের চাষ আরম্ভ করেন। অল্প ব্যয়ে অধিক লাভ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল; তাঁহারা তাহার জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দাদন দেওয়া একটি প্রধান। দাদনের অর্থ কৃষকদিগকে অগ্রিম অর্থ দেওয়া। দরিদ্র কৃষকগণ অগ্রিম অর্থ পাইলে আরও অনেক কাজে লাগাইতে পারিবে বলিয়া দাদন লইত; এবং ভাল ভাল জমিতে নীল বুনিবে এবং অপরাপর প্রকারে নীলকরদিগের সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত থাকিত। তৎপরে তাহারা নীলকরদিগের দাসরূপে পরিণত হইত। নীলকরগণ জোর করিয়া উৎকৃষ্ট জমিতে নীল বুনাইয়া লইতেন; বলপূর্বক তাহাদিগের গো-লাঙ্গলাদি ব্যবহার করিতেন; তাঁহাদের আদেশানুসারে কার্য করিতে না চাহিলে প্রহার করেন, গৃহদাহ প্রভৃতি নৃশংস অত্যাচার করিতেন; এবং অনেক স্থলে জমিদার হইয়া বসিয়া অবাধ্য প্রজাদিগকে একেবারে ধনেপ্রাণে সারা করিতেন।

কয়েক বৎসরের মধ্যে এই-সকল অত্যাচার এতই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, গবর্নমেণ্ট উপদ্রব নিবারণের উদ্দেশ্যে নূতন আইন করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাহাতে বিপদ আরও পাকিয়া গেল। অবশেষে অনুমান ১৮৫৮ কি ৫৯ সালে লক্ষ লক্ষ প্রজা ধর্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইল যে নীলের দাদন লইবে না, বা নীলের চাষ করিবে না। তখন নীলকর ইংরাজগণ তাঁহাদের অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিলেন। যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি জেলার জমিদারগণের ও প্রজাগণের সহিত নীলকরদিগের জোর বিবাদ বাধিয়া গেল। অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি নীলকরদিগের স্বজাতীয়, সুতরাং প্রজারা প্রায়ই সুবিচার লাভ

করিত না। কিন্তু তাহারা ইহাতেও দমিত না; অনেকে ধনে প্রাণে সারা হইয়া যাইত, তবু নিরস্ত হইত না। এই সময়ে হরিশ্চন্দ্র অত্যাচারিত প্রজাদের পক্ষ হইয়া লেখনী ধারণ করিলেন। অবশেষে প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টাতে গবর্নমেণ্ট এই ১৮৬০ সালেই "ইণ্ডিগো কমিশন" নামে এক কমিশন নিযুক্ত করিলেন। তাহার সভ্যগণ জেলায় জেলায় ঘুরিয়া নীলের অত্যাচার বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। হরিশ কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। চারিদিক হইতে নীলকরদিগের উপর ছি ছি রব উঠিল। নীলকরগণ জাতক্রোধ হইয়া আর্কিবল্‌ড হিলস নামক একজন নীলকরকে খাড়া করিয়া পেট্রিয়টের নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। প্রথমে সুপ্রিম কোর্টে ফৌজদারি মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইল। ভবানীপুর সুপ্রিম কোর্টের এলাকাভুক্ত নয় বলিয়া সে মোকদ্দমা উঠিয়া গেল। কিন্তু এই-সকল গোলমাল হরিশের ভগ্ন শরীরে আর সহিল না।

মানুষের দেহে আর কত সয়। সে সময়ে যাঁহারা হরিশের দুরন্ত পরিশ্রম দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে রাত্রির কয়েক ঘণ্টা কাল ব্যতীত হরিশের আর বিশ্রাম রহিল না। একে 'পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদকতার কাজ, সেজন্য তাঁহাকে রাশি রাশি সংবাদপত্র পড়িতে হইত ও প্রবন্ধাদি লিখিতে হইত, তদুপরি দিবারাত্রি নীলকর-প্রপীড়িত প্রজাবৃন্দের সমাগম। তাঁহার ভবন সর্বদা লোকারণ্য থাকিত। কাহারও দরখাস্ত লিখিয়া দিতে হইতেছে, কাহাকেও উকিলের নিকট সুপারিশ চিঠি দিতে হইতেছে, কাহারও মোকদ্দমার হাল শুনিতে হইতেছে। বিশ্রাম নাই। অনেকদিন অফিস হইতে ফিরিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আর অফিসের পোশাক বদলাইবার সময় পাইতেন না। অফিসের কলম ছাড়িয়া আসিয়া আবার কলম ধরিয়া বসিয়া যাইতেন। তাঁহার জননী এই গুরুতর শ্রমের প্রতিবাদ করিয়া টিকটিক করিতেন। বলিতেন, "ওরে, মানুষের শরীরে এত শ্রম সবে না, ওরে মারা পড়বি, ওরে কলম রাখ।" তদুত্তরে তিনি বলিতেন—"মা, তোমার সব কথা শুনব, এই গরিব প্রজাদের জন্য যা করছি, তাতে বাধা দিও না, ওরা ধনেপ্রাণে সারা হল, এ কাজ না করে আমি ঘুমাতে পারব না।" এই অতিরিক্ত পরিশ্রমে ১৮৬১ সালের জুন মাসে ৩৭ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

একদিকে যখন ইণ্ডিগো কমিশন ও পেট্রিয়টের সহিত বিবাদ প্রভৃতির উপক্রম, তখন অপরদিকে ১৯৬০ সালের আশ্বিন মাসে দীনবন্ধু মিত্রের সুবিখ্যাত "নীলদর্পণ" নাটক প্রকাশিত হইল। এই আর-এক ঘটনা যাহাতে বঙ্গসমাজে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিল। কোন গ্রন্থবিশেষে যে সমাজকে কতদূর কম্পিত করিতে পারে তাহা অগ্রে আমরা জানিতাম না। "নীলদর্পণ" কে লিখিল তাহা জানিতে পারা গেল না; বাসাতে বাসাতে "ময়রানী লো সই নীল গেজেছে কই?" ইত্যাদি দৃশ্যের অভিনয় চলিল। যতদূর

স্মরণ হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। পাদরী জেমস লং সাহেব তাহা নিজের নামে প্রকাশ করিলেন। ইংলণ্ডেও আন্দোলন উপস্থিত হইল। নীলকরগণ আসল গ্রন্থকারকে না পাইয়া ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদককে মুখপাত্র করিয়া ১৮৬২ সালের ১৯শে জুলাই লং-এর নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।

বিচারে লং-এর এক মাস কারাবাস এবং হাজার টাকা জরিমানা হইল। তখন নীলকর-বিদ্বেষ এদেশীয়দিগের মনে এত প্রবল যে জরিমানার হুকুম হইবামাত্র, মহাভারতের অনুবাদক সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়, জরিমানার হাজার টাকা গুনিয়া দিলেন। এরূপ শুনিয়াছি যে আরও অনেক দেশীয় ভদ্রলোক আদালতে জরিমানার টাকা দিবার জন্য টাকা লইয়া উপস্থিত ছিলেন।

## অনুশীলনী

১। এদেশের কোন্ অঞ্চলে কবে নীল চাষের আরম্ভ হয়? কাহারা আরম্ভ করে?

২। দাদন প্রথাটির অর্থ কি? ইহাতে কাহার সুবিধা? কাহার অসুবিধা?

৩। নীলকর সাহেবরা প্রজাদের উপর কিরূপ অত্যাচার করিত?

৪। নীলচাষীদের ধর্মঘট কবে হয়? তাহাদের দাবী কি ছিল?

৫। নীলকরদের সঙ্গে চাষীদের বিবাদে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট কিরূপ ব্যবহার করিত? কেন?

৬। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কে? তিনি কিভাবে নীলচাষীদের আন্দোলনে সাহায্য করিতেন? তাঁহার পত্রিকার নাম কি? নীলকর সাহেবরা তাঁহার উপর কিরূপ প্রতিশোধ লইল?

৭। ইণ্ডিগো কমিশন কবে, কেন গঠিত হয়? কমিশন কি করে?

৮। নীলদর্পণ কি? কাহার লেখা? ইহাতে কি আছে?

৯। কাহার চেষ্টায় নীলদর্পণের অনুবাদ হয়? তাঁহার উপর নীলকরেরা কি ধরনের প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করে?

১০। নীলবিদ্রোহ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের ভূমিকা অনধিক দুইটি বাক্যে প্রকাশ কর—

(ক) হরিশ মুখোপাধ্যায় (খ) রেভারেণ্ড লং (গ) দীনবন্ধু মিত্র (ঘ) কালীপ্রসন্ন সিংহ।

১১। নীলচাষ বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কিরূপ ভূমিকা গ্রহণ করে? (ক) নীলদর্পণ, (খ) পেট্রিয়ট, (গ) ইণ্ডিগো কমিশন।

১২। (ক) অনেক স্থলে জমিদার……সারা করিবেন।—কাহার লেখা, কোন্ রচনা হইতে এই অংশ উদ্ধৃত? প্রসঙ্গ উল্লেখ কর। উদ্ধৃতির বক্তব্য নিজের ভাষায় বুঝাইয়া দাও?

(খ) "কোন গ্রন্থবিশেষে……জানিতাম না।"—কাহার লেখা, কোন্ রচনা হইতে এই অংশ গৃহীত? প্রসঙ্গ নির্দেশ কর। উদ্ধৃতির বক্তব্য বুঝাইয়া দাও।

১৩। শেষ অনুচ্ছেদের ক্রিয়াপদগুলির কাল নির্ণয় কর।

১৪। শব্দার্থ লেখ :—জরিমানা, আদালত, উপস্থিত, সুপ্রসিদ্ধ, অনুবাদক হুকুম, বিদ্বেষ, লেখনী, গ্রন্থকার, প্রতিশ্রুত, সংগ্রহ।

১৫। "বিচারে লং-এর-এক মাস কারাবাস এবং হাজার টাকা জরিমানা হইল।"—লং সাহেব কে? তাঁহার এই সাজা হইল কেন? জরিমানার টাকা কে দিলেন? কেন?

### মৌখিক প্রশ্ন

১। নীলচাষীরা কত সালে ধর্মঘট করে?

২। নীলদর্পণ কে লেখেন?

৩। হরিশ্চন্দ্রের পত্রিকার নাম কি?

৪। নীল আন্দোলন প্রসঙ্গে কার জেল হয়?

৫। কার জরিমানার টাকা কে দিয়েছেন?

### অতিরিক্ত মন্তব্য

দাদন, কোম্পানি, জরিমানা, ম্যাজিস্ট্রেট, আদালত, হাজার, ফৌজদারি, মোকদ্দমা, এলাকা, কমিশন, কোর্ট, দরখাস্ত, পাদরী—এগুলি বিদেশী শব্দ। ইংরেজী, আরবী, ফারসী, পোর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে।

# ইংরেজপূর্ব বাংলার ঐশ্বর্য

## সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

**লেখক-পরিচয়।** একান্ত আধুনিক কালের লেখক। সতীন্দ্রমোহন বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে বই লিখিয়া বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়াছেন।

[ **রচনা-পরিচয়।** এই প্রবন্ধটিতে নবাবী আমলে বাংলার কৃষিজাত ও শিল্পদ্রব্যের যে ঐশ্বর্য ছিল তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বিদেশী ইংরেজরা এদেশে যে নিদারুণ দারিদ্র্য আনিয়াছিল, এদেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্যের গোড়ায় আঘাত করিয়াছিল তাহা বুঝা যায় পূর্বেকার এই গৌরবময় অবস্থা দেখিয়া। ]

বাংলার ব্যবসাবাণিজ্য ছিল উদ্ভিজ্জ সম্পদ দিয়ে; রেশম, কার্পাস সূতা, চাল, চিনি, আফিং ও নীল। কিছু কিছু পাটের চাষও ছিল, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে। এই উদ্ভিজ্জ বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পও অবশ্য কিছু গড়ে উঠেছিল। সাধারণ গৃহস্থালির নিত্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র, চাষ-আবাদের উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম, ছুতোর মিস্ত্রী প্রভৃতির যন্ত্রপাতি প্রায় প্রতি গ্রামেই তৈরি হত। মোটামুটি গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর। কিন্তু শিল্প ক্রমে বেড়ে উঠল রেশম ও কার্পাস অবলম্বনে। প্রথমটি পশ্চিমবঙ্গে, দ্বিতীয়টি পূর্ববঙ্গে।

এর পূর্বে তো বটেই, এমন কি অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগেও বাংলা হিন্দুস্থানের অন্যান্য প্রদেশের অনেক মালের চাহিদা মিটিয়ে দেশের বাইরেও নানা দ্রব্যসম্ভার পাঠাত। মাদ্রাজে যেত চাল, পাট, পাটের দড়ি, খাদ্যতেল ও সল্টপিটার। সল্টপিটার পাওয়া যেত পাটনায়; পাটনা তখন ছিল বাংলার অন্তর্ভুক্ত। নুন ও চিনি যেত দিল্লী ও আগ্রা। চিনি, আফিং, নানাপ্রকার শস্য ও সূতীর কাপড় যেত আরবে পারস্যে। এ ছাড়া পাশ্চাত্ত্যের বণিকেরা আরো অনেক জিনিস নিয়ে যেত।

মোটের উপর সেকালে বাংলা ছিল সর্বদেশীয় বণিকের তীর্থক্ষেত্র। পাশ্চাত্ত্যের নানা দেশীয় বণিকের দল ছাড়াও এখানে পারস্য, আরব, আবিসিনিয়া, তুর্কীস্থান থেকে সওদাগরেরা আসত। আর আসত ইহুদী ও আর্মেনিয়ানরা। সমগ্র প্রাচ্যে বাংলাই ছিল সেকালে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র।

বলা বাহুল্য, এ কেন্দ্রের প্রধান পণ্য ছিল রেশম ও কার্পাসজাত দ্রব্য। বাংলার জাতীয় শিল্পও ছিল বস্ত্রবয়ন। মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের কাজ ও পিতলের বাসনপত্র, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প, ঢাকার সূচীকর্ম ও শঙ্খশিল্প, ঢাকার স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার দেশে ও বিদেশে পরম আদরণীয় হয়েছিল বটে, তবে বাংলার বস্ত্রের মর্যাদার তুলনায় সে-গৌরব হীনগৌরব।

এ বস্ত্রশিল্পের রূপ দ্বিবিধ ; কার্পাস ও রেশম। কার্পাসশিল্প ছিল বাংলার পূর্ব-রাজধানী ঢাকা-কেন্দ্রিক ; রেশম, পরবর্তী রাজধানী মুর্শিদাবাদের সম্পদ।

কার্পাস-শিল্পের পরম গৌরব মসলিন বা আব-ই-রওয়ান্। এ কাপড়ের সূক্ষ্মতার পরিমাপ কল্পনাগত। মসলিন ছাড়া মোটা কাপড়ও অবশ্য অনেক রকম তৈরি হত ; সাদা ও রঙিন। এই মোটা সূতী কাপড়েরই কিছুটা অংশ কালিকট বন্দর থেকে 'ক্যালিকো' নাম নিয়ে চলে যেত দেশ-দেশান্তরে। ইংলণ্ডে এই ক্যালিকোর প্রথম আমদানি হয় ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। রঙিন ক্যালিকোর পরিচ্ছদ পরিধান করে রানী দ্বিতীয় মেরি নূতন ফ্যাশানের প্রবর্তন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের ঘরে ক্যালিকোর মর্যাদা রাতারাতি বেড়ে যায়। রঙিন ক্যালিকোর পরিচ্ছদ, পরদা, শয্যা-আবরণী, কুশন ইত্যাদিতে দেশ ছেয়ে যায়। এর ফলে ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পের ক্ষতি হয় অসামান্য। তাই ক্রমে আইন করে ইংলণ্ডে ক্যালিকোর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়।

মসলিন তৈরি হত ঢাকায়, সোনারগাঁয়ে ও ধামরাই-এ। সোনারগাঁ ও ধামরাই ঢাকা থেকে বিশ-ত্রিশ মাইল দূরে। মসলিনের সূতা হাতে কাটত সাধারণত অল্পবয়সী হিন্দু মেয়েরা ; এদের বয়স ছিল আঠারো থেকে ত্রিশের মধ্যে। দৃষ্টি-শক্তি কমে যেত বলে আরো বেশি বয়সের মেয়েরা এত সূক্ষ্ম সূতা হাতে কাটতে পারত না। বস্ত্র বয়ন করত পুরুষেরা। বয়নের সাজ-সরঞ্জাম ছিল অতি সাধারণ। সর্বত্রই এ কাজ করত হিন্দুরা, শুধু সোনারগাঁয়ে মুসলমানেরাও এ কাজ করত। মসলিনের সূতা কিন্তু কখনো চরকায় কাটা যেত না, সবই তৈরি হত হাতে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের পত্নী নূরজাহানের কালে সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদে, মসলিন দিল্লিতে বাদশাহের অন্তঃপুরে স্থান পায়। হয়ত নূরজাহান তাঁর পূর্ব স্বামী শের আফগানের সঙ্গে বাংলায় ঘর করতে এসে প্রথম মসলিনের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর কালে একখানা সরেস মসলিন শাড়ির দাম ছিল শ' চারেক টাকা।

বিদেশী পর্যটকদের চোখে সেকালে বঙ্গজননী অপরূপ রূপেই প্রতিভাত হয়েছিলেন। বাংলা যে তখন অন্নাভাব ও বস্ত্রাভাবের কথা স্বপ্নেও কল্পনা করত পারত না একথা সবাই সমস্বরে বলে গেছেন। তারপরে, সেকালের বাংলার রাজস্বই যে ক্ষীয়মাণ মোগল-সাম্রাজ্যের প্রধান বল ও ভরসা ছিল একথা তো ইতিহাস-বিশ্রুত।

বাংলার এই পরম ঐশ্বর্যের লোভেই ঘেঁষাঘেঁষি করে এসে ইংরেজ, ফরাসা, ডাচ ও দিনেমার ফলাও করে এদেশে তাদের কারবার শুরু করেছিল।

এবার সেকালের বাংলার ঐশ্বর্যের প্রতীক মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজারের কথা বলা যাক। পূর্বতন মুকসুদাবাদ বা পরবর্তী কালের মুর্শিদাবাদের বাজার জমজমাট হতে শুরু করে সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগেই। মুর্শিদাবাদের গা ঘেঁষেই কাশিমবাজার, সৈঁদাবাদ ও কালিকাপুর। এগুলি প্রকৃতপক্ষে একই শহরের বিভিন্ন অংশমাত্র। ইংরেজ এসে কুঠি করল কাশিমবাজারে, ফরাসী সৈদাবাদে, আর ডাচ কালিকাপুরে, কলকাতা শহরের পত্তনের প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগে। মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজারের প্রধান পণ্য রেশম। কুঠিগুলি ফ্যাক্টরি; সেখানে রেশমের সূতা ও কাপড় তৈরি করা হত। এগুলি আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পূর্বপুরুষ। ডাচের কুঠিতে কাজ করত প্রায় আটশ লোক, ইংরেজের কুঠিতেও লোকের সংখ্যা অনুরূপ; ফরাসীর কিছু কম। কর্মীর সংখ্যা বিবেচনা করেই কুঠির কাজের পরিমাণ অনুমান করা যেতে পারে। প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ ঐতিহাসিক আর্মি বলেছেন, মোগল-সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলাই ছিল সর্বশীর্ষে; পাশ্চাত্যের সকল বণিক-সঙ্ঘের সর্বাপেক্ষা বেশি মূলধন খাটত এদেশে, আর তার বেশির ভাগই নিয়োজিত ছিল রেশমের কাজে। বাংলায় বছরে রেশম তৈরি হত প্রায় পৌনে দুকোটি টাকার। একালেই ইংরেজের হিসেবের খাতায় দেখা যায়, কাঁচা রেশমের দর ছিল সাড়ে চার টাকা সের। কাজেই বাংলায় সত্তর আশি হাজার মণ রেশম তৈরি হত বলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না।

বাংলার ধান, বাংলার রেশম বাঙালীকে মাত্র দু-তিনশ বছর আগে সমগ্র হিন্দুস্থানে সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী করে রেখেছিল।

## অনুশীলনী

১। ইংরেজ আমলের আগে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা কেমন ছিল? কি জাতীয় পণ্যের উপরে তাহা নির্ভর করিত? পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে কোন্ কোন্ শিল্প প্রধান হইয়া উঠে?

২। বাংলা ভারতের অন্যান্য কোন্ কোন্ স্থানে কি কি পণ্য পাঠাইত? বাংলায় বহির্ভারতের কোন্ কোন্ স্থানের বণিকেরা ভিড় জমাইত?

৩। বাংলার কোন্ কোন্ শিল্পদ্রব্য দেশবিদেশে বিশেষ আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল?

৪। ক্যালিকো কি? সেকালে ইংলণ্ডে কেন ক্যালিকোর ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়?

৫। মসলিন কি? এর বৈশিষ্ট্য কি? কিভাবে এই সূতা তৈরি

হইত? বাংলার কোন্ অঞ্চল ইহার জন্য বিখ্যাত ছিল? মোগল বাদশাহদের অন্তঃপুরে কে মসলিনের প্রবর্তন করেন? তখন ইহার দাম কিরূপ ছিল?

৬। বিদেশী বণিকেরা বাংলাদেশে এত ভিড় করিত কেন? তখন বাংলার আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল?

৭। ইংরেজ-পূর্ব বাংলার প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র ছিল কোন্‌টি? এই শহরের এলাকা ও শহরতলির পরিচয় দাও। এখানকার প্রধান পণ্য কি ছিল?

৮। মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজারে বিদেশীরা কিসের ব্যবসা বেশি করিত? রেশম উৎপাদনে বাংলার ভূমিকা কি ছিল? মোগলসাম্রাজ্যে ব্যবসার ক্ষেত্রে বাংলার স্থান কোথায় ছিল?

৯। "বাংলা যে তখন অন্নাভাব……বলে গেছেন।" কোন্ রচনা হইতে এই অংশ গৃহীত? প্রসঙ্গ উল্লেখ কর। বক্তব্য বিশ্লেষণ কর।

১০। "বাংলার ধান, বাংলার রেশম……করে রেখেছিল।" কোন্ রচনা হইতে এই অংশ উদ্ধৃত? প্রসঙ্গ নির্দেশ কর। উদ্ধৃতাংশের বক্তব্য নিজের ভাষায় বুঝাইয়া দাও।

১১। পদ পরিবর্তন কর ঃ—ঐশ্বর্য, বাণিজ্য, শহর, সম্পদ, প্রবর্তন, পাশ্চাত্ত্য, রেশম, ধান।

১২। সমাস নির্ণয় কর ও ব্যাসবাক্য বল ঃ—কল্পনাগত, শয্যা-আবরণী, ইতিহাস-বিশ্রুত, বস্ত্রাভাব, বণিকসঙ্ঘ।

১৩। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ—কল্পনাগত, বস্ত্রাভাব, সর্বাপেক্ষা, রৌপ্যালঙ্কার

১৪। ইংরেজ-পূর্ব ভারতে নিম্নলিখিত নগরগুলি শিল্পবাণিজ্যের ব্যাপারে কি/ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল—

মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, কালিকট

১৫। "সেকালের বাংলার ঐশ্বর্যের প্রতীক মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজার—" কেন একথা বলা হইয়াছে?

### মৌখিক প্রশ্ন

১। ইংরেজ-পূর্ব যুগে বাংলার কোন্ অঞ্চলে রেশম শিল্পের বিস্তার হয়?
২। কোন্ অঞ্চলে পশম শিল্পের বিস্তার ঘটে?
৩। আব-ই-রওয়ান্ কি? কোথায় তৈরি হত?
৪। মোগল-সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে সর্বশীর্ষে ছিল কোন্ প্রদেশ?
৫। ইংরেজ, ফরাসী ও ডাচদের বাণিজ্যকুঠি কোথায় ছিল?

### অতিরিক্ত মন্তব্য

রচনাটি স্থান ও বস্তুর নামে পূর্ণ। তার মধ্যে তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী ও সব রকমের শব্দ আছে। কিন্তু বাক্যবিন্যাসের গুণে কোথাও তা ভাষাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে নি।



# কাবুলের বাজার

### সৈয়দ মুজতবা আলী

**লেখক-পরিচয়।** মুজতবা আলী ( ১৯০৪-১৯৭৪ ) সাহেবের ভাষা ও রচনার ভঙ্গীটি যেমন কৌতুকে ভরা তেমনি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। কিছু গল্প-উপন্যাস লিখিলেও প্রধানত ভ্রমণকাহিনী ও সরস নিবন্ধ লেখার জন্য তিনি জনপ্রিয় হইয়াছেন।

[ **রচনা-পরিচয়।** ভ্রমণ-কাহিনীর একটি ছোট অংশ এই বর্ণনাটি। কাবুলের বাজারের একটি বাস্তব ছবি এখানে ফুটিয়াছে। আরও বড় কথা, লেখকের ভাষা এবং রচনাভঙ্গি। এই ভাষায় কৌতুকের উজ্জ্বল স্পর্শটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মতো। ]

এক

কাবুলের একটি দ্রষ্টব্য তার বাজার। অমৃতসর, আগ্রা, কাশীর পুরানো বাজার যাঁরা দেখেছেন, এ বাজারের গঠন তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। সরু রাস্তা, দুদিকে বুক-উঁচু ছোট ছোট খোপ। পানের দোকানের দুই বা তিন-ডবল সাইজ। দোকানের সামনের দিকটা খোলা বাক্সের ঢাকনার মতো এগিয়ে এসে রাস্তার খানিকটা দখল করেছে।

বুকের নিচ থেকে রাস্তা অবধি কিংবা তারো কিছু নিচে দোকানেরই একতলা গুদাম-ঘর, অথবা মুচির দোকান। কাবুলের যে কোনো বাজারে শতকরা ত্রিশটি দোকান মুচির। পেশওয়ারের পাঠানরা যদি হপ্তায় একদিন জুতোতে লোহা পোঁতায়, তবে কাবুলে তিন দিন। বেশির ভাগ লোকেরই কাজকর্ম নেই—কোনো একটা দোকানে লাফ দিয়ে উঠে বসে দোকানীর সঙ্গে আড্ডা জমায়, ততক্ষণ নিচের অথবা সামনের দোকানের একতলায় মুচি পয়জারে গোটাকয়েক লোহা ঠুকে দেয়।

স্বপ্নসম লোকযাত্রা। খাস কাবুলের বাসিন্দারা চিৎকার করে একে অন্যকে আল্লারসুলের ডরভয় দেখিয়ে সওদা করছে, বিদেশীরা খচ্চর গাধা ঘোড়ার পিঠে বসে ভাঙা ভাঙা ফার্সিতে দরকসর করছে, বুখারার বড় কারবারি ধীরে গম্ভীরে দোকানে ঢুকে এমনভাবে আসন নিচ্ছেন যে, মনে হয় বাকী দিনটা ঐখানেই বেচাকেনা, চা-তামাক-পান আর আহারাদি করে রাত্রে সরাইয়ে ফিরবেন—তাঁর পিছনে চাকর হুঁকো-কল্কি সঙ্গে নিয়ে ঢুকছে। তারও পিছনে খচ্চর-বোঝাই বিদেশী কার্পেট। আপনি উঠি উঠি করছিলেন, দোকানদার

কিছুতেই ছাড়বে না। হয়ত মোটা রকমের ব্যবসা হবে, খুদা মেহেরবান, ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর রসুলের আশীর্বাদ রয়েছে, আপনারও যখন ভয়ঙ্কর তাড়া নেই, তখন দাওয়াতটা খেয়ে গেলেই পারেন।

রাস্তার অনেক অকেজো ছেলে-ছোকরা ঘোরাঘুরি করছে—তাদেরই একটাকে ডেকে বলবে, 'বাচ্চা, চা-ওয়ালাকে বল তো আর একপ্রস্থ চা দিয়ে যেতে।'

তারপর সেইসব কার্পেটের বস্তা খোলা হবে। কত রঙ, কত চিত্রবিচিত্র নকশা, কী মোলায়েম স্পর্শসুখ। কার্পেটশাস্ত্র অগাধ শাস্ত্র—তার কূল-কিনারাও নেই। কাবুলের বাজারে অন্তত ত্রিশ জাতের কার্পেট বিক্রি হয়, তাদের নিজের জাতের ভিতরে বহু গোত্র বহু বর্ণ। জন্মভূমি, রঙ, নকশা মিলিয়ে সরেস-নিরেস মালের বাছবিচার হয়।

## দুই

কাবুলের বাজার ক্রমেই গরিব হয়ে আসছে।

তবু প্রাণ আছে, আনন্দ আছে। বাজারের শেষ প্রান্তে প্রকাণ্ড সরাই। সেখানে সন্ধ্যার নামাজের পর সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য কাজকর্মে ইস্তফা দিয়ে বেঁচে থাকার মূলকে রসগ্রহণ দিয়ে চাঙ্গা করে তোলে। মঙ্গোলরা পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে, ভারী-রাইডিং বুট পরে, বাবরী চুলে ঢেউ খেলিয়ে গোল হয়ে সরাই-চত্বরে নাচতে আরম্ভ করে। বুটের ধমক, তালে তালে হাততালি আর সঙ্গে সঙ্গে কাবুল শহরের চতুর্দিকের পাহাড় প্রতিধ্বনিত করে আমুদরিয়া-পারের মঙ্গোলসঙ্গীত। থেকে থেকে তানের সঙ্গে ঝাকুনি দিয়ে মাথা নিচু করে দেয়, আর কানের দুপাশের বাবরী চুল সমস্ত মুখ ঢেকে ফেলে। লাফ দিয়ে তিন হাত উপরে উঠে শূন্যে দু পা দিয়ে ঘন ঘন ঢেরা কাটে, আর দু হাত মেলে দিয়ে বুক চেতিয়ে মাথা পিছনের দিকে ঠেলে বাবরী চুল দিয়ে সবুজ জামা ঢেকে দেয়। কখনো কোমর দুভাঁজ করে নিচু হয়ে বিলম্বিত তালে আস্তে আস্তে হাততালি, কখনো দুহাত শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে ঘূর্ণিহাওয়ার চর্কিবাজি। সমস্ত ক্ষণ চক্কর ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে।

আবার এই সমস্ত হট্টগোল উপেক্ষা করে দেখবেন, সরাইয়ের এক কোণে কোনো ইরানী কানের কাছে সেতার রেখে মোলায়েম বাজনার সঙ্গে হাফিজের গজল গাইছে। আর পাঁচজন চোখ বন্ধ করে বুঁদ হয়ে দূর ইরানের গুল বুলবুলের ছবি মনে মনে এঁকে নিচ্ছে।

## অনুশীলনী

১। কাবুলের বাজারের সঙ্গে কোন্ কোন্ স্থানের বাজারের মিল লক্ষ্য করিয়াছেন লেখক ? মিল কোন্ দিকে ?

২। কাবুলের বাজারে কিসের দোকান খুব বেশি ? বেশির ভাগ লোক বাজারে আসিয়া কি করে ?

৩। কাবুলের বাজারে লোকের কিরূপ ভিড় ? তাহারা কি কি কাজে ব্যস্ত ?

৪। কার্পেট কেনা-বেচা সম্পর্কে লেখক কি মন্তব্য করিয়াছেন ?

৫। বর্তমানে কাবুলের বাজারের আর্থিক অবস্থা কিরূপ ?

৬। বাজারের প্রান্তে সরাইতে কাহারা ভিড় করে ? তাহারা সেখানে কিভাবে আনন্দ-উৎসব করে ?

৭। 'সরাইয়ের এক কোণে কোনো ইরানী·········এঁকে নিচ্ছে।' এই অংশ কোন্ রচনা হইতে গৃহীত ? প্রসঙ্গ উল্লেখ কর। বক্তব্যটি নিজের ভাষায় বুঝাইয়া দাও।

৮। শব্দার্থ লেখ ও বাক্য রচনা কর ঃ—বাসিন্দা, পয়জার, দাওয়াত, মেহেরবান, ইস্তফা, চক্কর।

৯। শেষ অনুচ্ছেদের সমাপিকা ক্রিয়াগুলির কাল নির্ণয় কর।

১০। পদ পরিবর্তন কর ঃ—বিলম্বিত, উৎক্ষিপ্ত, দখল, দুভাঁজ, আশীর্বাদ, রঙ, প্রতিধ্বনিত।

১১। মঙ্গোলদের পোশাক-পরিচ্ছদ কিরূপ ? তাহাদের গান ও নাচের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

১২। বুখারার বড় কারবারি কিভাবে দোকানে ঢুকিতেছে ? দোকানদার কিভাবে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে ?

১৩। "কার্পেট শাস্ত্র অগাধ শাস্ত্র"—এই মন্তব্য করা হইল কেন ? বক্তার কিরূপ মনোভাব ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে ?

১৪। হাফিজ কে ? গজল কাহাকে বলে ?

১৫। ইরানী, মঙ্গোল, বুখারা, পেশওয়ার—ইহাদের সম্বন্ধে টীকা লেখ।

১৬। এই রচনাটি হইতে দশটি বিদেশী শব্দ নির্বাচন কর।

## মৌখিক প্রশ্ন

১। কাবুলের বাজারের সঙ্গে এদেশের কোন্ কোন্ বাজারের বাইরের চেহারার সঙ্গে মিল ?

২। কাবুলের বাজারে শতকরা ত্রিশটি দোকান কিসের ?

৩। কাবুলের বাজারে কত রকম কার্পেট পাওয়া যায় ?

৪। লেখক বিশেষভাবে কাদের নাচের বর্ণনা দিয়েছেন ?

৫। এই রচনায় কার গজলের উল্লেখ আছে ? তিনি কোন্ দেশের লোক ?

## অতিরিক্ত মন্তব্য

১। রচনাটিতে প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার আছে।

২। মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশের নাম, নানা জাতির পোশাক-পরিচ্ছদের বিবরণ, আচার-আচরণের বর্ণনা—সব মিলে একটা আঞ্চলিক রূপ ফুটে উঠেছে।

# মহানিষ্ক্রমণ

## শিশির কুমার বসু



**লেখক-পরিচয়।** শিশিরকুমার বসু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। নেতাজীর জীবনী বিষয়ে তাঁহার কিছু মূল্যবান লেখা আছে।

[ **রচনা-পরিচয়।** নেতাজী কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের চোখে ধুলা দিয়া দেশত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ দিয়াছেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শিশিরকুমার বসু। তিনি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং প্রধান সহায়কও ছিলেন। নেতাজী বাহিরে গিয়া দেশ স্বাধীন করার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। সেইরূপ উদ্দেশ্য নিয়াই তাঁহার মহানিষ্ক্রমণ –মহান স্বাধীনতা-সংগ্রামী সুভাষচন্দ্রের জীবনের তথা ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ]

সেই বিশেষ দিনটি শেষ পর্যন্ত এসে পড়ল। আমি যেন একটা ঘোরের মধ্যে সব কাজ করে যাচ্ছিলাম। তবে আমার ভেতরের চাপা উত্তেজনা আমি বাইরে প্রকাশ করছিলাম না। শেষের দিকে রাঙাকাকাবাবু ( অর্থাৎ নেতাজী সুভাষচন্দ্র ) আমাকে একদিন বললেন—'আমি অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। অনেকদিন—হয়তো কুড়ি বছর আমি দেশে ফিরতে পারব না, তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না।'

আমার ভাগ্যে কি ঘটবে সে সম্বন্ধে অন্তর্ধানের দিন যত এগিয়ে এল ওঁর মতামত একটু পাল্টে গেল। প্রথম দিকে তিনি যেন ভেবেছিলেন পুরো ব্যাপারটার গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হবে। আমি খুব বিপদে পড়ব না। কিন্তু যাবার আগে উনি দুটো গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন। এক, 'যদি কোনমতে তোমরা চার-পাঁচদিন চেপে রাখতে পারো, আমি পগার পার হয়ে যাব।' দ্বিতীয়ত, এই অন্তর্ধানে আমার ভূমিকা বেশিদিন গোপন থাকবে না, কারণ প্রকাশ হয়ে যাবার সূত্র অনেক। তাই আমাকে বলেছিলেন, পুলিসের নির্যাতন ও দীর্ঘদিন কারাবাসের জন্য প্রস্তুত থাকতে। আমার দিকে একটু চেয়ে বলেছিলেন—'কি আর হবে, যুদ্ধ যতদিন চলে, জেলে থাকবে। যেমন দেশের অনেকেই আছে।'

আমাদের ওয়ানডারার গাড়িটার সেদিন সার্ভিস হচ্ছিল। সার্ভিস হতে এত

অসম্ভব সময় নিতে লাগল যে, আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। বেশ সন্ধ্যা হয়ে যাবার পর সার্ভিস হয়ে এল। আমি মালপত্র গুছিয়ে রাখলাম।

আমি গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এলগিন রোডের দিকে না গিয়ে উল্টো দিকে গাড়ি ঘোরালাম। লোয়ার সার্কুলার রোডে একটি পেট্রল স্টেশনে ঢুকে গাড়িতে তেল ভরে নিলাম। চাকার প্রেসারটা ঠিক আছে কিনা দেখলাম ও ব্যাটারি চেক করলাম, তারপর চৌরঙ্গী দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এসে পশ্চিম দিক থেকে এলগিন রোডের বাড়িতে ঢুকলাম। আমি খুব স্বাভাবিকভাবেই গাড়ি চালিয়ে এসে এলগিন রোডের বাড়িতে ঢুকে গেলাম আর বাড়ির পিছন দিককার সিঁড়ির কাছে গাড়ি পার্ক করলাম।

কোটটা গাড়িতে রেখে আমি নিতান্ত নিরুদ্বিগ্ন মুখ করে দোতলায় উঠে গেলাম।

রাঙাকাকাবাবু তখন জামা-কাপড় ছেড়ে সিল্কের ধুতি ও চাদর পরে নিচ্ছেন, নির্জনবাসের যে ব্রত তিনি গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা করেছেন সেই ব্রত শুরু হবার আগে মা ও পরিবারের অন্যান্য সকলের সামনে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে শেষবার আহার গ্রহণ করলেন। ইলা, দ্বিজেন আর অরবিন্দ ঘরে পর্দা লাগাবার ব্যবস্থা করছে। ঘরের উত্তর প্রান্তে মাটিতে বসে রাঙাকাকাবাবু তাঁর সেই বিশেষ আহার গ্রহণ করলেন। ওঁকে ঘিরে বসেছিলেন ওঁর মা, বউদিদিরা আর ভাইপো-ভাইঝির দল—বলা বাহুল্য, আমিও তাদের অন্যতম। খাওয়া শেষ হলে মা-জননী ও অন্যান্যরা একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ওঁরা ঘুণাক্ষরেও জানলেন না যে, এই বিদায় দীর্ঘ বিদায় হতে চলেছে। রাঙাকাকাবাবুর মুখ থমথমে দেখাচ্ছিল, কিন্তু উনি নিজেকে সংযত রেখেছিলেন।

রাঙাকাকাবাবু তাঁর এই ব্রত পালনের সঙ্কল্পের কথা পরিবারের সকলের কাছে বেশ বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পেরেছিলেন। তাঁর এই স্বেচ্ছাকৃত নির্জনবাসের সময় কিভাবে কি করতে হবে সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুরকে কিভাবে পর্দার ওপার থেকে খাবার দিতে হবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ক্রমশ রাত্রি গভীর হলে বাড়ির সকলে তিনতলায় যে যার ঘরে শুতে গেলেন। বাইরে যাবার লম্বা টানা করিডর ও বাড়ির পিছন দিককার সিঁড়ি আর একবার দেখে নেওয়া হল, সব ঠিক আছে।

ঘরের সেই পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে রাঙাকাকাবাবু মহম্মদ জিয়াউদ্দিনের পোশাক পরে নিলেন, ওঁর বেডিংটা গুটিয়ে ঠিক করে নেওয়া হল। রাঙাকাকা-বাবু ওঁর বাদামী রঙের গলাবন্ধ লম্বা কোটের সঙ্গে ঢোলা পায়জামা পরলেন আর মাথায় কালো ফেজ টুপি। ছদ্মবেশের ব্যাপারে শেষ মুহূর্তে উনি একটা পরিবর্তন করলেন। বললেন, আমি যে কাবুলী চপ্পল জোড়া ওঁর

জন্য কিনেছিলাম সেটা পরে হাঁটা-চলা করা ওঁর পক্ষে কষ্টকর, তাই পুরানো ফিতে-বাঁধা মজবুত যে জুতো উনি য়ুরোপে ব্যবহার করতেন তাই পরে নিলেন। তাইতে উনি বেশি আরাম পেলেন বটে কিন্তু এই জুতা-বিভ্রাটের ফলে পরে আমাদের একটু বিপদে পড়তে হয়েছিল। যে চশমাটা উনি সে সময় পরতেন সেটা ছেড়ে রেখে বছর দশেক আগের পুরানো রোল্ডগোল্ডের ফ্রেমওয়ালা গোল কাঁচের চশমাটা সঙ্গে নিলেন। বলেছিলেন, যখন একলা থাকবেন বা অন্ধকারে, তখন চশমা ব্যবহার করবেন, নয়তো চশমা ছাড়াই চলবেন।

হোল্ডঅল হাতে অরবিন্দ আগে, তারপর রাঙাকাকাবাবু, পিছনে আমি। তিনজনে করিডরের দেওয়াল ঘেঁষে, পা টিপে টিপে চললাম। সেদিন আকাশে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না, রাঙাকাকাবাবু সাবধান করে দিলেন দেওয়ালে যেন ছায়া না পড়ে। একেবারে সাইলেণ্ট মার্চ করে আমরা পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়ির কাছে এসে পড়লাম।

রাঙাকাকাবাবু বসে যাবার পর আমি বেশ আওয়াজ করে চটি জুতো ফটফট করে গাড়িতে উঠলাম ও দরজাও সশব্দে বন্ধ করলাম। আমার এত সব চেষ্টাকৃত গোলমালে দূরে কোথায় কয়েকটা কাক ডেকে উঠল। বাইরের গেটটা অরবিন্দ এগিয়ে গিয়ে খুলে দিল, আমি যেন তুমুল গর্জন করে গাড়ি চালিয়ে জোরে বেরিয়ে গেলাম।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার এক ফাঁকে রাঙাকাকাবাবু আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি যেন প্রথমত দক্ষিণমুখো যাই—যদিও আমাদের গন্তব্য উত্তরে।

এলগিন রোড উডবার্ন রোডের মোড়ে তক্তাপোশ পেতে সি-আই-ডির লোকেরা তাদের হেড কোয়ার্টার পেতে ছিল। আমরা যখন বেরিয়ে গেলাম তারা সম্ভবত কম্বল মুড়ি দিয়ে আরামে ঘুমোচ্ছিল।

ঘণ্টাখানেক ড্রাইভ করার পর আমি রাঙাকাকাবাবুকে বললাম—'আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন না!' রাঙাকাকাবাবু বললেন—'না। সেটা তোমার পক্ষে ভাল হবে না। গাড়ির একমাত্র আরোহী যদি ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে যে ড্রাইভ করছে তারও ক্লান্তি এসে যায়। তার চাইতে চালকের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথাবার্তা বলে তাকে সঙ্গ দেওয়া উচিত।'

হঠাৎ একবার রাঙাকাকাবাবু বললেন, 'ডি ভ্যালেরার এসকেপের গল্প জানো তো?'

বললাম, 'জানি। সেই কেকের ওপর চাবির ছাপ দিয়ে জেলের ভেতরে পাচার করে দেওয়া—তারপর সেই ছাপ থেকে চাবি তৈরি করে নেওয়ার কাহিনী তো?' আমি আবার শেষের কদিনে কতকগুলি বিখ্যাত এসকেপের কাহিনী পড়ে নিয়েছিলাম।

বর্ধমানের পথে একটি রেলের বন্ধ লেভেল ক্রসিং-এ আমি হঠাৎ গাড়ির ব্রেক কষতে এক ঝলক পেট্রল বেশি এসে পড়াতে এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। রাঙাকাকাবাবু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। আমি ওঁকে আশ্বস্ত করে বললাম, দু-এক মিনিট অপেক্ষা করলে ঠিক হয়ে যাবে। উনি তখন আমার জন্যে কফি ঢালতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। গাড়ি যথারীতি স্টার্ট নিল। ট্রেনও তো অনেকক্ষণ চলে গেছে, কিন্তু লেভেল ক্রসিং-এর গেট আর খোলে না। শীতের রাতে লোকটি ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি গাড়ি থেকে নেমে দরজায় ধাক্কাধাক্কি ও বিরাট হাঁকডাক আরম্ভ করলাম এবং লোকটিকে প্রায় টেনে বার করলাম। রাঙাকাকাবাবু অপরিচিত লোকের এত কাছে যাওয়া ও কথাবার্তা বলা মোটেই পছন্দ করলেন না।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। বর্ধমান পৌঁছতে প্রায় রাত চারটে হল। আসানসোলের কাছাকাছি যখন এলাম সবে ভোর হয়ে আসছে—চারদিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন, শহরের একটু বাইরে একটা পেট্রল স্টেশন দেখতে পেয়ে আমি পেট্রল ভরে নিতে চাইলাম। রাঙাকাকাবাবু এটা একেবারেই পছন্দ করলেন না। পেট্রলভর্তি টিনটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'না নিলেই নয় ?' আমি বললাম, 'একটা টিন রিজার্ভ থাকা ভালো, কোন ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়।'

আসানসোল থেকে ধানবাদের পথে খটখটে সকালবেলার রোদ্দুরে ড্রাইভ করতে হল। এই প্রথম আমার মনে হল রাঙাকাকাবাবুর ছদ্মবেশটা সত্যিই ভালো।

দিনের বেলা ধানবাদ শহরের মধ্য দিয়ে যেতে আমার অত্যন্ত অস্বস্তি হচ্ছিল এবং যতটা পারি জোরে চালাচ্ছিলাম। চেনা শহর, যদি আমাদের কেউ দেখে ফেলে ! ধানবাদ ছেড়ে বারারির পথ ধরলাম।

······গোমো স্টেশনের কাছাকাছি রাস্তাটা আরো খারাপ। স্টেশন-চত্বরে যখন পৌঁছলাম ট্রেন আসার সময় প্রায় হয়েছে। মালপত্র—হোল্ডঅল সুটকেশ আর অ্যাটাচি কেস নামিয়ে দিয়ে কুলির জন্য হাঁকডাক করতে লাগলাম। একজন ঘুমন্ত চেহারার কুলি এসে মালগুলো তুলে নিল।

'আমি চললাম, তোমরা ফিরে যাও'—বিদায়মুহূর্তে এই ছিল তাঁর শেষ কথা। আমি কেমন যেন নির্বাক ও নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলাম, প্রণাম করার কথাও মনে এল না। রাত্রের গোমো স্টেশনের নির্জন ওভারব্রিজ দিয়ে রাঙাকাকাবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দৃপ্ত অথচ ধীর ভঙ্গিতে হেঁটে চলে যাচ্ছেন, আগে আগে চলেছে কুলি, তার মাথায় মালপত্র—চিরদিনের মতো এই ছবিটি আমার মনে মুদ্রিত হয়ে রইল। ওপারের সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাঙাকাকাবাবু প্লাটফরমের দিকে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

ততক্ষণে মেল ট্রেনের গুমগুম ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আমরা গাড়ি নিয়ে একটু দূরে এসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। হুস হুস শব্দে ট্রেন এসে থামল ও আবার ছেড়ে দিল। আমরা কান পেতে ট্রেনের আওয়াজ শুনতে লাগলাম। তারপর ট্রেনের চাকার ছন্দোময় ঝঙকারের সঙ্গে অন্ধকারের বুকে একটা আলোর মালা দুলে দুলে দূরে চলে গেল দেখতে পেলাম।

২৭-১-৪১ তারিখে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—

গত রবিবার অপরাহ্ণ হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁহার বাসভবনের কক্ষে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনবর্গের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি দিবারাত্র এই কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন।

সকলেই ইহা অবগত আছেন যে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। গত কয়েকদিন যাবৎ তিনি সম্পূর্ণ মৌনাবলম্বন করেন এবং সকলের সহিত এমন কি আত্মীয়স্বজনের সহিতও দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া ধর্মচর্চায় সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া উদ্বেগের মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোন ফল হয় নাই এবং সংবাদ ছাপিতে দেওয়ার সময় পর্যন্ত তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন নাই বলিয়া জানা গেল।

### অনুশীলনী

১। "সেই বিশেষ দিনটি" বলিতে কি বোঝানো হইয়াছে? সুভাষচন্দ্র কি স্থির করিয়াছিলেন? কাহাকে আপনার পরিকল্পনার সঙ্গী করিয়াছিলেন? সংগীর সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে তিনি কি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন?

২। সুভাষচন্দ্র কোন্ বাড়িতে ছিলেন? তাঁহার নির্জনবাসের ব্রত কি? এই ব্রত গ্রহণের পিছনে কি উদ্দেশ্য ছিল?

৩। মহম্মদ জিয়াউদ্দিন কে? সুভাষচন্দ্র যাত্রার সময়ে কি পোশাক পরিয়াছিলেন? কেন এইরূপ পোশাক পরিলেন?

৪। কিভাবে যাত্রা করা হইল? ব্রিটিশের পুলিশ-গোয়েন্দারা কি করিতেছিল? তাহাদের চোখে কি কৌশলে ধুলা দেওয়া হইল?

৫। সুভাষচন্দ্রের গাড়ি কে চালাইতেছিলেন? তাঁহারা কোন্ পথে কোন্ দিকে যাইতেছিলেন? পথের মধ্যে কোনো অসুবিধা ঘটিয়াছিল কি? কিভাবে তাহা দূর হইল?

৬। কোন্ স্টেশন হইতে সুভাষচন্দ্র ট্রেনে চাপিলেন? তিনি কিভাবে বিদায় নিলেন? সঙ্গের মালপত্র কিভাবে ট্রেনে তুলিয়া দেওয়া হইল?

৭। সংবাদপত্রে সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগ বিষয়ে কি খবর বাহির হয়?

করে বাহির হয় ? তাঁহার প্রকৃত গৃহত্যাগের কয়দিন পরে এই খবর বাহির হয় ?

৮। "তাই আমাকে বলেছিলেন পুলিশের নির্যাতন ও দীর্ঘদিন কারাবাসের জন্য প্রস্তুত থাকতে।"—কে কাহাকে কখন এই কথা বলেন ? এই অংশটি কোন্ রচনা হইতে উদ্ধৃত ? রচনাটি কাহার লেখা ? উদ্ধৃতাংশের বক্তব্য নিজের ভাষায় বুঝাইয়া বল।

৯। "ডি ভ্যালেরার এসকেপের গল্প জানো তো ?" একথা কে কাহাকে কখন বলেন ? এই অংশটি কাহার লেখা, কোন্ রচনা হইতে উদ্ধৃত ? ডি ভ্যালেরা কে ? তাঁহার 'এসকেপের' কৌশলটি কি ছিল ?

১০। "একটা আলোর মালা দুলে দুলে দূরে চলে গেল দেখতে পেলাম।"—এই অংশটি কাহার লেখা, কোন্ রচনা হইতে উদ্ধৃত ? প্রসঙ্গ নির্দেশ কর। কথাটির মধ্যে কোন গভীর তাৎপর্য আছে কিনা বুঝাইয়া দাও।

১১। ধাক্কাধাক্কি, হাঁকডাক, কথাবার্তা—প্রায় একই অর্থের দুইটি শব্দ মিশাইয়া এই শব্দগুলি গঠিত—ইহার ফলে অর্থের কি বিশিষ্টতা দেখা দিয়াছে ?

১২। সমাস বল, ব্যাসবাক্য বিশ্লেষণ কর—নির্জনবাস, ভাইপো-ভাইঝি, ফিতে-বাঁধা, অনিশ্চিত।

১৩। পদ পরিবর্তন কর ঃ—অবগত, অতিবাহিত, প্রত্যাবর্তন, অসুস্থ, ঝঙ্কার, নিস্পন্দ, মুক্তি, অবস্থান, উদ্বেগ, সঞ্চার।

১৪। টীকা লেখ ঃ ডি ভ্যালেরা, জিয়াউদ্দিন, শিশিরকুমার, অরবিন্দ বসু।

## মৌখিক প্রশ্ন

১। দেশত্যাগের সময়ে সুভাষচন্দ্র কোন্ স্টেশন থেকে রেলে চাপেন ?

২। কে গাড়ি চালিয়ে সুভাষচন্দ্রকে কলকাতার বাইরে নিয়ে যান ? সঙ্গে আর কে ছিলেন ?

৩। দেশত্যাগ করার সময়ে তিনি কি ছদ্মবেশ পরলেন ?

৪। কি নাম তিনি গ্রহণ করেছিলেন ?

৫। কলকাতা ছাড়িয়ে তিনি কোন্ কোন্ শহরের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন ?

## অতিরিক্ত মন্তব্য

১। হাঁকডাক, হুসহুস—এ জাতীয় শব্দকে বলে ধ্বন্যাত্মক শব্দ। ধ্বনি বা আওয়াজ দিয়ে এরা একটা ভাব প্রকাশ করে। এগুলি দেশী শব্দ—সংস্কৃত থেকে আসে নি।

২। "একটা টিন **রিজার্ভ** থাকা ভাল।" "ডি ভ্যালেরার **এসকেপের** গল্প জানো তো ?"—বাঙালীর কথাবার্তার ভাষায় এমনি ইংরেজী শব্দ স্বাভাবিকভাবেই স্থান পেয়ে গেছে।



# মহাকাশ অভিযান ও আর্যভট্ট

## জিতেন্দ্রকুমার গুহ

**লেখক-পরিচয়।** বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কারকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করিয়া প্রবন্ধ লেখা সহজ ব্যাপার নয়। বাংলাভাষায় এরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া সম্প্রতি যাঁহারা নাম করিয়াছেন জিতেন্দ্রকুমার গুহ তাঁহাদের অন্যতম।

[ **রচনা-পরিচয়।** পৃথিবীর প্রধান রাষ্ট্রগুলি মহাকাশ-অভিযানে অনেকদূর আগাইয়া গিয়াছে। তাহাদের তুলনায় ভারতের অগ্রগতি খুবই সামান্য। তবু ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যে নিষ্ক্রিয় বসিয়া নাই ১৯৭৫ সনে মহাকাশে আর্যভট্ট প্রেরণের মধ্য দিয়া তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় বিজ্ঞানের এই সাধনার কথাই বর্তমান প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। ]

1971 সনে সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী প্রস্তাব দিলেন ভারত নকল উপগ্রহ তৈরি করলে রাশিয়া সেটিকে কক্ষপথে স্থাপন করে দিতে সম্মত আছে।

1972 সনের মে মাসে ভারতের সঙ্গে সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। তদনুযায়ী প্রস্তাবিত কৃত্রিম উপগ্রহটি আকারে ও আয়তনে অনেক বড় হয়ে প্রায় 353 কিলোগ্রাম ওজনের হবে এবং তার নকশা তৈরি ও নির্মাণকার্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সর্বতোভাবে ভারতীয়দের হাতে ন্যস্ত থাকবে। প্রয়োজনমত বৈজ্ঞানিক পরামর্শ রাশিয়া সরবরাহ করতে প্রস্তুত এবং রাশিয়ার ঘাঁটি থেকেই শক্তিশালী রকেটের সাহায্যে উপগ্রহটি আকাশে কক্ষপথে উৎক্ষিপ্ত হবে।

কর্মসম্পাদনের জন্যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক উপগ্রহ সংস্থা ( **Indian Scientific Satellite Project** সংক্ষেপে **ISSP** ) নামে একটি প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্গালোরে গঠিত হলো। 1972 সনের অক্টোবর মাসে কাজের সূত্রপাত হয়। তারই ফল— 1975 সনের 19শে এপ্রিল ভারতীয় বৈজ্ঞানিক উপগ্রহ আর্যভট্টের রাশিয়ার এক উৎক্ষেপণমঞ্চ থেকে মহাকাশের কক্ষপথে স্থাপন।

**ISSP**-এর চেয়ারম্যান ছিলেন অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান এবং উপগ্রহ প্রস্তুতের কর্মাধিনায়ক বা ডিরেক্টর ছিলেন অধ্যাপক ইউ. আর. রাও। প্রস্তাবিত উপগ্রহটির নকশা অঙ্কন ও অনুমোদনের পর এটি নির্মিত হয় ব্যাঙ্গালোরের উপকণ্ঠে পিন্নাই নামক স্থানে।

বহুতলবিশিষ্ট হীরকখণ্ডের মতো হয়েছিল উপগ্রহটির বাইরের রূপ। ছাব্বিশখানা ধাতব ফলক পর পর একত্র সংলগ্ন করে একে প্রায় গোলাকৃতি করা হয়। এটির উচ্চতা 1.7 মিটার এবং ব্যাস 14·7 মিটার। উপগ্রহের দেহটি সর্বতোভাবে অ্যালুমিনিয়াম ও অন্য কয়েকটি ধাতুর দ্বারা গঠিত। উপগ্রহের খোলটি এভাবে নির্মাণের পর এর অভ্যন্তরে রক্ষিত হলো নির্দিষ্ট কর্মোপযোগী যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও আনুষাঙ্গিক সাজসরঞ্জাম সুবিন্যস্তভাবে।

ভারতের প্রাচীন মনীষী আর্যভট্টের সম্মানার্থে উপগ্রহটির নামকরণ করা হয়েছে আর্যভট্ট। আর্যভট্ট ছিলেন অসামান্য প্রতিভাধর জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতশাস্ত্রবিদ্। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে কমলনগরে অর্থাৎ বর্তমান পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিখ্যাত সূর্য-সিদ্ধান্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, সূর্যের সম্মুখে পৃথিবী একটি অক্ষ অবলম্বনে আবর্তন করে বলেই পৃথিবীতে দিবা ও রাত্রির উদ্ভব হয়—যে তথ্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোপারনিকাস আবিষ্কার করেছিলেন। বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতিতেও তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান আছে। ভারতের প্রথম বৈজ্ঞানিক উপগ্রহের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত হওয়া খুবই সমীচীন হয়েছে।

ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা ও সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী পরস্পরের সঙ্গে অনবরত সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। কাজেই রাশিয়া ভারতের এই ভারী উপগ্রহটিকে উৎক্ষেপণের জন্যে শক্তিশালী রকেট নিয়ে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিল। 1975 সালে 17 এপ্রিল আর্যভট্টকে রাশিয়ায় পাঠানো হয়। 19শে এপ্রিল মস্কোর সন্নিকটে বেয়র্স লেক নামক উৎক্ষেপণ ঘাঁটি থেকে আন্তর্জাতিক (**Intercosmos**) রকেটের সাহায্যে আর্যভট্টকে আকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়। আর্যভট্ট দ্রুত কক্ষপথে চলে গেল। মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখলেন **ISSP**-এর অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান, অধ্যাপক ইউ. আর. রাও, জনা চল্লিশেক ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্ এবং রাশিয়ায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ডি. পি ধর। তাছাড়া এখানে উপস্থিত ছিলেন অনেক রুশীয় বিজ্ঞানী, রুশীয় মহাকাশ সংস্থার সর্বাধিনায়ক এবং বহুসংখ্যক রুশীয় নাগরিক। এই সর্বাত্মক সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে রুশীয় সর্বাধিনায়ক ভারতীয় অধ্যাপকদ্বয়কে দুটি পদক উপহার দেন। শুধু ভারতের নয়—কানাডা, পশ্চিম জার্মেনি, অস্ট্রেলিয়া, ইটালি প্রভৃতি দেশের প্রস্তুত কৃত্রিম উপগ্রহ রাশিয়াই উৎক্ষেপণ করে দিয়েছে রাশিয়ার মঞ্চ থেকে রুশীয় আন্তর্জাতিক রকেটের সাহায্যে এবং তারা সব সাফল্যের সঙ্গে কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছে।

বিষুব সমতলের সঙ্গে 50° ডিগ্রী কৌণিক হেলনে প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে আর্যভট্ট পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। একবার ভূপ্রদক্ষিণ করে আসতে আর্যভট্টের সময় লাগে 96·41 মিনিট। ভূপৃষ্ঠ থেকে আর্যভট্টের কক্ষপথের সর্বোচ্চ দূরত্ব 623 কিলোমিটার ও সর্বনিম্ন দূরত্ব 564 কিলোমিটার।

ভারতে অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীহরিকোটায় এবং রাশিয়ার বেয়র্স লেকে একটি করে গবেষণা-কেন্দ্র অবস্থিত। উভয় কেন্দ্র থেকেই প্রয়োজনমত নির্দেশ পাঠিয়ে

আর্যভট্টের কর্মপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ করা যায়, আবার আর্যভট্ট-কর্তৃক প্রেরিত বেতার-সঙ্কেত উভয় কেন্দ্রের টেপ রেকর্ডারে লিপিবদ্ধ করে রাখা যায়।

উৎক্ষেপণের পর তিন দিন পর্যন্ত বেয়র্স লেক ও শ্রীহরিকোটা—এই দুই স্থানের গবেষণাগারের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্গণের হাতে যৌথভাবে উপগ্রহটির নিয়ন্ত্রণভার ন্যস্ত ছিল। তারপর সে-ভার সম্পূর্ণভাবে শ্রীহরিকোটার কর্মীদের হাতে অর্পিত হয়। শ্রীহরিকোটার এইসব বিজ্ঞানী ও কর্মীরা অনেকেই বেয়র্স লেকে উপস্থিত থেকে উপগ্রহের উৎক্ষেপণ চাক্ষুষ দেখেছেন ও পরে ভারতে ফিরে এসেছেন।

আকাশে কক্ষপথে স্থাপিত হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আর্যভট্ট বেতারে পৃথিবীর দিকে বার্তা পাঠাতে আরম্ভ করে। সেটি বেয়র্স লেকের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময়ে ও শ্রীহরিকোটার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময়ে উভয় গবেষণাকেন্দ্রেই ঐ সকল বার্তা ও তথ্য অতি দ্রুত স্বল্প সময়ের মধ্যে টেপ রেকর্ডারে লিপিবদ্ধ হতে থাকে।

উৎক্ষেপণের কয়েকদিন পরে উপগ্রহের মধ্যস্থিত চৌদ্দটি বিদ্যুৎবাহী নালীর মধ্যে একটি অকেজো হয়ে পড়ে। তার ফলে তিনটি যন্ত্রের কাজকর্ম শুব্ধ হয়ে যায়। তৎসত্ত্বেও উপগ্রহটির অন্যান্য সকল যন্ত্রপাতি স্বাভাবিকভাবে আশানুরূপ কর্মসূচী অনুসরণ করে চলেছে। —১৯৭৬

## অনুশীলনী

১। কোন্ দেশের সহযোগিতায় ভারতে কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মিত হইল ? ভারত নিজে কোন্ কার্যের ভার লইল ? অন্য দেশ কোন্ কার্যের দায়িত্ব নিল ? ভারতে এই কার্যের ভার নিল কোন্ সংস্থা ?

২। ভারতীয় উপগ্রহটি কোথায় নির্মিত হয় ? কোন্ কোন্ বৈজ্ঞানিক এই কাজে নেতৃত্ব করেন ? উপগ্রহটির চেহারা কেমন ? ইহার ওজন, উচ্চতা ও ব্যাস কত ? ইহা নির্মাণে কত বৎসর সময় লাগে ?

৩। ভারতীয় প্রথম উপগ্রহটির নাম কি ? কাহার নামানুসারে এই নামকরণ হয় ? সেই ব্যক্তির বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় দাও। তিনি কত বছর আগেকার লোক ছিলেন ?

৪। কোথা হইতে আর্যভট্ট মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় ? কিভাবে ? সেখানে কাহারা উপস্থিত ছিলেন ? এই কেন্দ্র হইতে অন্য কোন্ কোন্ দেশের কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হইয়াছে ?

৫। আর্যভট্ট কত সময়ে কিভাবে পরিক্রমণ করিতেছে? পৃথিবী হইতে তাহার দূরত্ব কত? ভারতের কোথাকার গবেষণাকেন্দ্র হইতে আর্যভট্টের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হইতেছে?

৬। আর্যভট্টের কাজকর্ম বর্তমানে (১৯৭৬ সাল পর্যন্ত) কিভাবে চলিয়াছে?

৭। নিম্নলিখিত বিষয়ের স্থান ও ব্যক্তির পরিচয় দাও ঃ—

(ক) আর্যভট্ট (খ) কোপারনিকাস (গ) কৃত্রিম উপগ্রহ (ঘ) রকেট (ঙ) শ্রীহরিকোটা (চ) উৎক্ষেপণমঞ্চ (ছ) বেয়র্স লেক (জ) সূর্য-সিদ্ধান্ত।

৮। "ভারতের প্রথম উপগ্রহটির সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত হওয়া খুবই সমীচীন হয়েছে।"—কাহার লেখা কোন্ রচনা হইতে এই অংশটি গৃহীত? প্রসঙ্গ নির্দেশ কর। বক্তব্যটুকু বুঝাইয়া দাও।

৯। পদ পরিবর্তন কর ঃ—ভারতীয়, উৎক্ষিপ্ত, প্রস্তাবিত, রক্ষিত, অসামান্য আবর্তন, উদ্ভব।

১০। শেষ অনুচ্ছেদের ক্রিয়াপদগুলির কাল নির্ণয় কর।

১১। কানাডা, পশ্চিম জার্মেনি, অস্ট্রেলিয়া, ইটালি—এই দেশগুলি কোথায় অবস্থিত?

১২। ISSP কথাটির প্রকৃত অর্থ কি? আর্যভট্টের সঙ্গে ইহার কি সম্পর্ক?

## মৌখিক প্রশ্ন

১। ISSP—পুরো নামটি কি?
২। ভারতের প্রথম উপগ্রহটির নাম কি?
৩। শ্রীহরিকোটা কি? কেন বিখ্যাত?
৪। ভারতের প্রথম উপগ্রহ কোথা থেকে মহাকাশে পাঠানো হয়?
৫। সূর্য-সিদ্ধান্ত কি?

## অতিরিক্ত মন্তব্য

১। বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দ ঃ নকল বা কৃত্রিম উপগ্রহ, কক্ষপথ, উৎক্ষেপণ, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিত, বিষুব সমতল, বিদ্যুৎবাহী নালী, প্রযুক্তিবিদ্, গবেষণা।

২। প্রয়োজনে বহু বিদেশী শব্দও রক্ষিত হয়ে থাকে। যেমন—রকেট।



# হনু-ভানু মিতালি

## কৃত্তিবাস ওঝা

**কবি-পরিচয়।** পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি কৃত্তিবাস। তিনি বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করেন। অনুবাদ অনেকটা স্বাধীন। এই কৃত্তিবাসী রামায়ণ গত পাঁচশ বছর ধরিয়া বাঙালীর ঘরে ঘরে পঠিত হইতেছে। এদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় বই এইখানি।

[ **রচনা-পরিচয়।** কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড হইতে এই অংশটুকু সংগৃহীত হইয়াছে। হনূমান গন্ধমাদন পর্বতে বিশল্যকরণী আনিতে গিয়াছিল—শক্তিশেলে মূর্ছিত লক্ষ্মণকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে প্রভাত হইবার পূর্বেই ঔষধ চাই—কিন্তু সে দেখিল সকাল হইবার আগেই সূর্য উঠিতেছে। ]

দিবাকর পূর্বদিকে প্রকাশ করিল।
তাহা দেখি হনূমান তরাস পাইল ॥
রথ আগুলিয়া বীর দাণ্ডায় সত্বর।
অচল হইয়া রথ সারথি ফাঁফর ॥
পূর্বদিকে আগুলিল হনুমান বীর।
পশ্চিমে চালায় রথ সারথি সুধীর ॥
ঘোড়ারে প্রতোদ-বাড়ি মারয়ে সঘনে।
পশ্চিমে চলিল রথ পবনগমনে ॥
কম্পিল সে হনূমান অতি ভয়ংকর।
লাফ দিয়া অশ্বগণে ধরিল সত্বর ॥
রথ ধরে হনূমান ঘন দেয় পাক।
বায়ুভরে ঘোরে যেন কুমারের চাক ॥
সারথি কহিছে তবে সূর্যের গোচর।
রথ ঘুরাইয়া রাখে একটা বানর ॥
পর্বতপ্রমাণ অঙ্গ বিকৃত আকার।
অচল হইল রথ নাহি চলে আর ॥

সূর্য কহে আমি সূর্য ছাড় দেহ পথ।
উদয় হইতে যাব উদয়-পর্বত ॥
বড় যুদ্ধ হইয়াছে আজিকার রণে।
পড়েছে লক্ষ্মণ বীর শক্তিশেল বাণে ॥
রজনী প্রভাত হৈলে মরিবে লক্ষ্মণ।
উদয় হইতে মোরে পাঠায় রাবণ ॥
রাবণের উপদ্রব সহিতে না পারি।
উদয় হইতে যাই থাকিতে শর্বরী ॥
ঔষধ আনিতে গেছে পবনকুমারে।
লক্ষ্মণে মারিব বীর না আসিতে ফিরে ॥

হনূমান বলে দেব কর অবধান।
পবনের পুত্র আমি নাম হনূমান ॥
ঔষধ আনিতে আমি আইনু শিখরে।
এই নিবেদন করি তোমার গোচরে ॥
প্রাণদান লক্ষ্মণ না পান যতক্ষণ।
তাবৎ উদয়-গিরি না কর গমন ॥
হাসিয়া বলেন সূর্য শুন হনূমান।
যত দেবগণ করে রামের কল্যাণ ॥
সাধে কি উদয়-গিরি যাই উদয়েতে।
দেবের নিস্তার নাহি রাবণের হাতে ॥
হনূমান বলে আছে উপায় ইহার।
নিকটেতে এস বলি কর্ণেতে তোমার ॥
তব নাম ভানু মম নাম হনূমান।
নামে নামে মিলিয়াছে দুজনে সমান ॥
এত শুনি দিবাকর হরষিত মন।
হনূর নিকটে আসি করে সম্ভাষণ ॥
সূর্যেরে ধরিয়া হনূ করে কোলাকুলি।
সাপটিয়া সূর্যেরে পুরিল কক্ষতলি ॥
মহাতেজোময় সূর্য রাখিতে কে পারে।
আপনি হইলা বন্দী লক্ষ্মণের তরে ॥
হনূ-ভানু ভঙ্গি দেখি দেবগণ হাসে।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

## অনুশীলনী

১। সূর্য কাহার আদেশে কেন রাত্রি থাকিতেই উদিত হইবার জন্য চলিয়াছেন ?

২। লক্ষ্মণকে কে শক্তিশেল মারিয়াছিল ? কেন মারিয়াছিল ? লক্ষ্মণ কিভাবে প্রাণ ফিরিয়া পাইল ?

৩। হনূমান কিভাবে সূর্যোদয় ঠেকাইল ? এই ঘটনায় তাহার চরিত্রের কিরূপ পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে ?

৪। 'হনূ-ভানু ভঙ্গি দেখি দেবগণ হাসে।'—কি দেখিয়া দেবতারা হাসিয়াছিল ? কেন হাসিয়াছিল ?

৫। (ক) "হাসিয়া বলেন সূর্য.......হাতে।"—কে কাহাকে কখন বলিয়াছিল ? কোন্ কবিতা হইতে ইহা গৃহীত ? উদ্ধৃতাংশের বক্তব্য বুঝাইয়া বল।

(খ) 'মহাতেজোময় সূর্য.........লক্ষ্মণের তরে।' কোন্ কবিতা হইতে এই অংশ উদ্ধৃত ? প্রসঙ্গ উল্লেখ কর। উদ্ধৃতাংশের বক্তব্য বুঝাইয়া বল।

৬। শব্দার্থ লেখ—দিবাকর, তরাস, আগুলিল, প্রতোদ-বাড়ি, ফাঁফর, কুমারের চাক, পর্বতপ্রমাণ, উদয়-পর্বত, শক্তিশেল, উপদ্রব, শর্বরী, অবধান, নিস্তার, হরষিত, সম্ভাষণ, কক্ষতলি, মহাতেজোময়।

৭। এই কবিতাটি হইতে পাঁচটি বিশেষণ পদ বাহির কর এবং তাহাদের দিয়া বাক্য রচনা কর।

৮। হনূমানের অন্য কোনো কীর্তি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৯। "নামে নামে মিলিয়াছে দুজনে সমান"—কে কাহাকে এই কথা বলিয়াছিল ? বক্তার উদ্দেশ্য কি ?

১০। সূর্য পূর্বদিকে প্রকাশ পাইতেছে দেখিয়া হনূমান কি করিল ? সূর্যের সারথি তখন কি করিল এবং কি বলিল ?

১১। সূর্য হনূমানকে কি অনুরোধ করিল ? দুজনে কি কথাবার্তা হইল ?

## মৌখিক প্রশ্ন

১। কবিতাটি কোন্ বইয়ের অন্তর্ভুক্ত ?

২। ঐ বইটি কোন্ সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ ?

৩। হনূমানের পিতার নাম কি ?

৪। লক্ষ্মণের কি হয়েছিল ?

৫। কুমারের চাক কি ?

## অতিরিক্ত মন্তব্য

১. দাণ্ডায়, সঘনে, আইনু, আগুলিল, ফাঁফর, গোচর, তাবৎ, হরষিত— এই শব্দগুলি আধুনিক কালে ঠিক এইরূপে আর ব্যবহৃত হয় না।

২. দিবাকর, সূর্য, ভানু—তিনটি সমার্থক শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য কর।



# মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন

## ভারতচন্দ্র রায়

**কবি-পরিচয়।** অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্র নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র-রায়ের সভাকবি ছিলেন। বহু ভাষা ও শাস্ত্রে দক্ষ ভারতচন্দ্র "অন্নদামঙ্গল" কাব্যের রচয়িতা। এই কাব্যে লেখকের রচনাশক্তির উচ্চাঙ্গের নিপুণতার প্রমাণ মেলে।

[ **রচনা-পরিচয়।** কবির 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য হইতে এই অংশটুকু গ্রহণ করা হইয়াছে। বাংলার একজন স্বাধীন ভূস্বামী প্রতাপ-আদিত্যের, কিছু বিবরণ থাকার ফলে এই অংশটুকুর বিশেষ মূল্য আছে। তাছাড়া ইংরেজ-পূর্ব বাংলার কবিতায় এইরূপ মসৃণ ভাষা ও রচনাভঙ্গি দুর্লভ বলিয়াও রচনাটি উল্লেখযোগ্য। ]

যশোর নগর ধাম প্রতাপ-আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বাহান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥
তার খুড়া মহাকায় আছিল বসন্ত রায়
রাজা তারে সবংশে কাটিল।
তার বেটা কচু রায় রানী বাঁচাইল তায়
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল॥
ক্রোধ হৈল পাতসায় বান্ধিয়া আনিতে তায়
রাজা মানসিংহে পাঠাইলা।
বাইশী লস্কর সঙ্গে কচু রায় লয়ে রঙ্গে
মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা॥
কেবল যমের দূত সঙ্গে যত রাজপুত
নানা জাতি মোগল পাঠান।
নদী বন এড়াইয়া নানা দেশ বেড়াইয়া
উপনীত হইল বর্ধমান॥

### অনুশীলনী

১। প্রতাপ-আদিত্য কোথাকার রাজা ছিলেন ? তিনি কোন্ বর্ণের লোক ?

২। প্রতাপ-আদিত্যের সময় ভারতের বাদশাহ কে ছিলেন ? তাঁহার সঙ্গে প্রতাপ-আদিত্যের কিরূপ সম্পর্ক ছিল ?

৩। 'ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ'—কাহার ভয়ে ? কোন্ ভূপতিদের কথা এখানে বলা হইয়াছে ? তাহারা দ্বারস্থ হইয়াছিল কেন ?

৪। প্রতাপ-আদিত্য কোন্ দেবতার বরপুত্র ছিলেন ? তাঁহার খুড়ার নাম কি ? রাজা খুড়ার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন ?

৫। বসন্ত রায় কে ? তাঁহার পুত্র কে ? প্রতাপ-আদিত্যের আক্রমণে পিতা-পুত্রের কি অবস্থা হইয়াছিল ?

৬। জাহাঙ্গীর বাদশাহের তাঁহার প্রতি কেন ক্রোধ হইল ? ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি কাহাকে কি আদেশ করিলেন ?

৭। মানসিংহ কে ? তিনি কেন বাংলায় আসিলেন ? তাঁহার সঙ্গে কাহারা ছিল ? তিনি কিভাবে কোথায় আসিয়া পৌঁছিলেন ?

৮। প্রতাপ-আদিত্যের সৈন্যবাহিনীতে কাহারা ছিল ? মানসিংহের সৈন্য-দলেই বা কাহারা ছিল ?

৯। জাহাঙ্গীর ও প্রতাপ-আদিত্যের মধ্যে বিবাদের কারণ কি ?

১০। বরপুত্র……কালী।—এই অংশটুকু কোথা হইতে উদ্ধৃত ? কি প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ? উদ্ধৃতাংশের বক্তব্য নিজের ভাষায় বুঝাইয়া দাও।

১১। পাতসায়, উপনীত, লস্কর, ঢালী, তুরঙ্গ, হলকা—শব্দগুলির অর্থ নির্ণয় কর।

১২। রাজপুত, মোগল, পাঠান—ইহারা কাহারা ?

১৩। প্রতাপ-আদিত্যের সাহস, বীরত্ব ও সেনাবলের কি পরিচয় এই কবিতায় আছে ?

### মৌখিক প্রশ্ন

১। যশোরের রাজার নাম কি ?

২। তাঁর সঙ্গে কার যুদ্ধ হয় ?

৩। বসন্ত রায় কে ?

৪। প্রতাপ-আদিত্য বসন্ত রায়কে কি করেছিল ?

৫। বসন্ত রায়ের পুত্র কে ?

৬। জাহাঙ্গীরকে কে খবর দিয়েছিল ?

### অতিরিক্ত মন্তব্য

লক্ষণীয় ঃ—

১. পাতসা, লস্কর, হলকা—প্রভৃতি বিদেশী (আরবী-ফার্সী) শব্দের ব্যবহার।

২. রাজপুত, মোগল, পাঠান প্রভৃতি বহিরাগত জাতির উল্লেখ।




**কবি-পরিচয়।** কবি মধুসূদন দত্ত যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত। মাতার নাম জাহ্নবী দেবী। পিতা অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি ছিলেন। মধুসূদন পিতার একমাত্র পুত্র। শৈশব হইতেই পিতা-মাতার আদরে খেয়ালী ও জেদী হইয়া উঠেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার প্রতিভা সম্পর্কে তিনি ও তাঁহার বন্ধুবর্গ সচেতন ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের অন্যতম সেরা ছাত্র ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া পিতার বিরাগভাজন হন। প্রথম জীবনে তিনি ইংরেজী ভাষায় কাব্য রচনায় ব্রতী হন, পরে সুহৃদবর্গের অনুরোধে মাতৃভাষায় কাব্য রচনা করেন। তাঁর স্বল্পকালব্যাপী কাব্যজীবনে তিনি বাঙলা সাহিত্যকে নব রূপ দান করেন। তাঁহার বহুমুখী কৃতিত্বের মধ্যে বাঙলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন—চতুর্দশপদী কবিতা রচনা এবং সার্থক নাটক ও প্রহসন রচনা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের মধ্যে মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, এবং নাটক ও প্রহসনের মধ্যে শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে তাঁহার মৃত্যু হয়।

[ **রচনা-পরিচয়।** কবির সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' হইতে এই অংশটুকু গ্রহণ করা হইয়াছে। মেঘনাদ যজ্ঞগৃহে নিরস্ত্র—পূজানিরত। ছদ্মবেশে লক্ষ্মণ আসিয়া উপস্থিত বিভীষণের সঙ্গে। মেঘনাদ কোষার আঘাতে লক্ষ্মণকে মূর্ছিত করিয়া অস্ত্রগৃহের দিকে ছুটিলেন কিন্তু শূল হস্তে বিভীষণ দ্বার আটক করিয়া রহিলেন। তাঁহার পরের কথা এই কবিতায় বলা হইয়াছে। ]

হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারি ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী।
সন্ধানি বিন্ধিলা শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেষ্বাস শরজালে বিঁধেন তারকে।

হায় রে রুধিরধারা ( ভূধর-শরীরে
বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা, )
বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী !
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারিপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে,
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে
সপ্ত রথী অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়, রথচক্র, কভু ভগ্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম, ভিন্ন বর্ম, যা পাইলা হাতে।
কিন্তু মায়াময়ী মায়া বাহু-প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দ সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে। সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষ্মণ-পানে গর্জি ভীমনাদে,
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী !
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে ;
শূল হস্তে শূলপাণি ; শঙ্খ, চক্র, গদা
চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ ; হেরিলা সভয়ে
দেবকুলরথীবৃন্দে সুদিব্য বিমানে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
নিষ্ফল, হায় রে মরি, কলাধর যথা
রাহু গ্রাসে ; কিংবা সিংহ আনায়-মাঝারে।
ত্যজি ধনুঃ নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে
নয়ন ! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র। থরথরি কাঁপিলা বসুধা ;
গর্জিলা উথলি সিন্ধু ! ভৈরব আরবে
সহসা পূরিল বিশ্ব ! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্যে মরামর জীব প্রমাদ গুণিলা
আতঙ্কে !······ ...

অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু,

রাক্ষসকুলভরসা পরুষ বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,—"বীরকুলগ্লানি,
সুমিত্রানন্দন, তুই ! শত ধিক্ তোরে !
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে !
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে !
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে ?"……
এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ ! লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্বাণ পাবক যথা, কিংবা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।

## অনুশীলনী

১। মেঘনাদের মৃত্যুর যে বর্ণনা কবি দিয়াছেন তাহা নিজের ভাষায় বিবৃত কর।

২। 'মেঘনাদের মৃত্যু' কবিতায় মেঘনাদের চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সংক্ষেপে বল।

৩। কবির ভালোবাসা ও সহানুভূতি যে লক্ষ্মণের দিকে নয়, মেঘনাদের দিকে—তাহা বুঝাইয়া বল।

৪। "বীরকুলগ্লানি সুমিত্রানন্দন, তুই।'—একথা কে কাহাকে কখন বলিয়াছিল ? কেন বলিয়াছিল ?

৫। নিচের উদ্ধৃতিগুলি—(১) কোথা হইতে গৃহীত ? (২) তাহাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ কর। (৩) উহাদের বক্তব্য বুঝাইয়া বল।

(ক) সন্ধানি বিন্ধিলা……মেদিনী।

(খ) সাপটি সত্বরে……রথচক্র।

(গ) বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি……আনায়-মাঝারে।

(ঘ) দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে……তোর হাতে ?

(ঙ) লঙ্কার পঙ্কজ-রবি……ভূতলে।

৬। শব্দার্থ লেখ—খরতর, অরিন্দম, তারকারি, মহেষ্বাস, ভূধর, তিতিয়া, মেদিনী, বাহু-প্রসরণে, খেদান, করপদ্ম-সঞ্চালনে, কেশরী, মহিষারূঢ়, দণ্ডধর,

নিষ্কল, কলাধর, আনায়, নিক্ষেপিলা, আরবে, প্রমাদ, অসুরারি-রিপু, পরুষ, শমন লোহ, আর্দ্রিল, পাবক, ত্বিষাম্পতি।

৭। মেঘনাদকে এই কবিতায় কি কি নাম এবং বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে? উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য কি?

৮। ব্যাসবাক্য লেখ এবং সমাস নির্ণয় কর—দৈত্যকুলদল, পঙ্কজ, মাতৃ-পিতৃপাদপদ্ম, যজ্ঞাগার, করপদ্ম-সঞ্চালন, শূলপাণি, চতুর্ভুজ, শোণিতার্দ্র, রাক্ষসকুল-ভরসা, বীরকুলগ্লানি।

৯। "অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি রিপু"—অসুরারি রিপু কে? অন্যায় সমরের কথা বলা হইল কেন?

১০। "যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে সপ্তরথী অস্ত্রবলে,"—অভিমন্যু কে? তাঁহার সম্বন্ধে কি বলা হইয়াছে? তাঁহার সঙ্গে কাহার তুলনা দেওয়া হইয়াছে? কেন?

১১। এই কবিতায় লক্ষ্মণকে কি কি নাম ও পরিচয়ে অভিহিত করা হইয়াছে?

১২। মেঘনাদ ও লক্ষ্মণের যে যুদ্ধের কথা এই কবিতায় আছে তাহাতে কে সশস্ত্র এবং কে নিরস্ত্র ছিল? নিরস্ত্র ব্যক্তি কিভাবে যুদ্ধ করিল? শেষ পর্যন্ত কাহার জয় হইল?

১৩। মেঘনাদ ও লক্ষ্মণের এই যুদ্ধে কাহাকে তোমার বড় বীর বলিয়া মনে হয়? কেন?

১৪। মৃত্যুর পূর্বে মেঘনাদ লক্ষ্মণকে কি বলিয়াছিল?

১৫। মেঘনাদের মৃত্যুর বর্ণনায় পাঠকের মনে একই সঙ্গে দুঃখ আর একটা বিশাল গৌরবের ভাব জাগিয়া উঠে কেন?

### মৌখিক প্রশ্ন

১। তারকারি কে?

২। সৌমিত্রি কে?

৩। রামানুজ বলতে এ কবিতায় কাকে বোঝানো হয়েছে?

৪। অন্যান্য রামানুজদের নাম বল।

৫। অভিমন্যুর পিতা-মাতার নাম কি?

### অতিরিক্ত মন্তব্য

মধুসূদনের কবিতায় সমাসবদ্ধ তৎসম পদ এবং ধ্বনিঝংকারে পূর্ণ শব্দের সমারোহ লক্ষ্য করবার মতো—

হুঙ্কারি, টঙ্কারিলা, অরিন্দম, মহেষ্বাস, ভূধর-শরীরে, জলস্রোত, যজ্ঞাগার, নিক্ষেপিলা, রথচূড়, রথচক্র, মশকবৃন্দ, করপদ্ম-সঞ্চালনে, ভীমনাদে, মহিষারূঢ়, দণ্ডধরে, শূলপাণি, চতুর্ভুজ, দেবকুলরথীবৃন্দ, নিক্ষেপিলা, মহাতেজাঃ, ফলক-আলোকে, অরিন্দম, খড়্গাঘাতে, শোনিতার্দ্র, অসুরারি-রিপু, রাক্ষসকুলভরসা, বীরকুলগ্লানি, দৈত্যকুলদল, মাতৃপিতৃপাদপদ্ম, পঙ্কজ-রবি, ত্বিষাম্পতি, শান্তরশ্মি।




**কবি-পরিচয়।** মধুসূদনের আদর্শে হেমচন্দ্র (১৮৩৮—১৯০৩) "বৃত্রসংহার" নামে মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন। ছোট আকারের কবিতায় তিনি দেশের পরাধীনতার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন।

[ **রচনা-পরিচয়।** ভারত যখন ইংরেজের অধীন তখনকার লেখা এই কবিতা। কবি দেশের মানুষকে পরাধীনতার বিরুদ্ধে জাগিয়া উঠিবার আহ্বান জানাইয়াছেন এখানে। ]

আর ঘুমাইয়ো না, দেখ চক্ষু মেলি,
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী
কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতূহলী
বিবিধ মানবজাতিরে লয়ে।

মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,
প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,
বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,
দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে।

বাজরে শিঙ্গা, বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।

জপ, তপ, আর যোগ, আরাধনা,
পূজা, হোম-যাগ, প্রতিমা-অর্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর কৃপাণে কর্ রে পূজা।

## অনুশীলনী

১। কবি এই কবিতায় কিভাবে জাতিকে জাগ্রত হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন ?

২। বিশ্বের অন্যান্য দেশের কি অবস্থা ? ভারতের কি অবস্থা ? কবির মতে ভারত কিভাবে উন্নতি করিতে পারে ?

৩। নিচের অংশগুলি কোথা হইতে উদ্ধৃত, কাহার রচনা ? উহাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ কর। বক্তব্য বুঝাইয়া দাও।

(ক) একবার শুধু……মহিমা-ধ্বজা।

(খ) জপ, তপ আর যোগ……কর্ রে পূজা।

৪। শব্দার্থ লেখ এবং বাক্য রচনা কর ঃ—অবনীমণ্ডলী, উল্লাস, অকুতোভয়, মহিমা-ধ্বজা, তূণীর, কৃপাণ, আরাধনা।

৫। ব্যাসবাক্য ও সমাস নির্ণয় কর ঃ—মানবজাতি, দৃঢ়পণ, হোম-যাগ, প্রতিমা-অর্চনা।

৬। কবি কাহাদের ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন ? কেন ?

৭। কোন্ পদ্ধতিতে ভারতের উন্নতি করা সম্ভব নয় বলিয়া কবির ধারণা ? তাঁহার মতে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে ?

৮। 'তূণীর কৃপাণে কর্ রে পূজা'—একথার আসল অর্থ কি ?

## মৌখিক প্রশ্ন

১। কার লেখা কবিতা ?

২। তাঁর একটি বড় কাব্যের নাম কর।

৩। এই কবিতার মূল ভাব এককথায় বল।

৪। যখন এ কবিতা লেখা হয় তখন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কি ছিল ?

## অতিরিক্ত মন্তব্য

(ক) পতাকা, ধ্বজা (খ) ভব, অবনী, মহী (গ) প্রবল, প্রচণ্ড (ঘ) পূজা, প্রতিমা-অর্চনা (ঙ) গৌরব, মহিমা।

(ক) (খ) প্রভৃতি শব্দগুচ্ছের মোটামুটি একই অর্থ—কিন্তু পৃথক পৃথক শব্দ। অবশ্য প্রয়োগের সময় শব্দের আওয়াজ এবং অন্য শব্দের নৈকট্য বুঝে নিলে ভালো হয়।

# সমুদ্র দর্শন



—বিহারীলাল চক্রবর্তী

**কবি-পরিচয়।** বিহারীলাল ( ১৮৩৫—১৮৯৪ ) বাংলা গীতিকবিতার স্রষ্টা। প্রকৃতির সৌন্দর্য, মানুষের মনের ব্যথা, আনন্দ প্রভৃতিই তাঁহার কবিতায় একমাত্র আলোচ্য বিষয়। তাঁহার লেখা "সারদা-মঙ্গল", "সাধের আসন" সবচেয়ে নামকরা কাব্য।

[ **রচনা-পরিচয়।** সমুদ্র দেখিয়া কবি অবাক হইয়াছেন, আনন্দিত হইয়াছেন। সেই ভাবটি এই বর্ণনার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ]

এ কি এ ! প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্মুখে আমার !
অসীম-আকাশ-প্রায় নীল জল-রাশি ;
ভয়ানক তোলপাড় করে অনিবার,
মুহূর্তেকে যেন সব ফেলিবেক গ্রাসি।

আগুপাছু কোটি কোটি কি কল্লোলমালা !
প্রকাণ্ড পর্বত সব যেন ছুটে আসে ;
উঃ প্রচণ্ডরব ! কানে লাগে তালা,
প্রলয়ের মেঘ যেন গরজে আকাশে।

তুলার বস্তার মতো ফেনা রাশি রাশি,
তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ধায় ;
রাশি রাশি সাদা মেঘ নীলাম্বরে ভাসি,
ঝড়ের সঙ্গেতে যেন ছুটিয়া বেড়ায়।

সমীরণ এমন কোথাও হেরি নাই,
ঝরঝর নিরন্তর লাগে বুকে মুখে ;
ব্রহ্মাণ্ডের বায়ু যেন হয়ে একঠাঁই,
ক্রমাগত আসে আজি মম অভিমুখে।

উঠিতেছে ফেনা সব বাতাসের ভরে,
ঝকঝকে বড় বড় আয়নার মতন
আহা ! মরি ! ও সবার ভিতরে ভিতরে,
এক এক ইন্দ্রধনু সেজেছে কেমন ।

যেন এরা সসম্ভ্রমে শূন্যে বেড়াইয়া,
দেখিতেছে জলধির তুমুল তাড়ন ;
যেন সব সুরনারী বিমানে চাপিয়া,
ভয়ে ভয়ে হেরিছেন দেবাসুর-রণ

ফর-ফর-নিশান চলেছে পোতশ্রেণী,
টলমল ঢলমল, তরঙ্গদোলায় ;
হাসিমুখী পরী সব আলুথালু বেণী,
নাচন্ত ঘোড়ায় চড়ে যেন ছুটে যায় ।

আপনার মনে ওহে উদার সাগর
গড়ায়ে গড়ায়ে তুমি চলেছ সদাই,
প্রাণীদের কলরবে পোরা চরাচর,
কিন্তু তব কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই ।

বড়ই মজার মিত্র পবন তোমার ;
তরঙ্গের সঙ্গে তার রঙ্গ নানাতর ;
গলা ধরাধরি করি ফিরি অনিবার
ট'লে ট'লে ঢ'লে ঢ'লে খেলে মনোহর ।

বেলার কুসুম-বনে পশিয়ে কখন,
সর্বাঙ্গ ভুর্ভুরে করে তার পরিমলে,
ভারে ভার আনে ফুল চিকন চিকন,
আদরে পরায়ে দেয় তরঙ্গের গলে ।

হয় তো হঠাৎ মেতে উঠে ঘোরতর,
তরঙ্গের প্রতি ধায় অসুরের প্রায় ;
ভয়ানক দাপাদাপি করে পরস্পর,
পরস্পর ঘোর ঘোষে বিশ্ব ফেটে যায় ।

না জানি ঝড়ের কালে হে মহাসাগর,
কর যে কি ভয়ানক আকার ধারণ ।
প্রলয়-প্রসুপ্ত সেই মূর্তি ভয়ানক,
ভেবে বিচলিতপ্রায় হইতেছে মন ।

যতই তোমার ভাব ভাবি হে অন্তরে,
ততই বিস্ময়-রসে হই নিমগন ;
এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যাহার উপরে,
না জানি আছে কি কাণ্ড ভিতরে গোপন।

## অনুশীলনী

১। 'মুহূর্তেকে যেন সব ফেলিবেক গ্রাসি"—কাহার সম্বন্ধে কে এই কথা বলিয়াছেন? কেন বলিয়াছেন?

২। সমুদ্রের ঢেউ দেখিয়া কবির কি মনে হইয়াছে? কবি ইন্দ্রধনুর সঙ্গে কাহার তুলনা করিয়াছেন? কেন করিয়াছেন?

৩। কবি সমুদ্রের ফেনার সঙ্গে কোন্ কোন্ বিষয়ের উপমা দিয়াছেন? উপমা-প্রয়োগ কতটা সার্থক হইয়াছে বল।

৪। সমুদ্রের উপরে ভাসমান পোতশ্রেণীর কিরূপ চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন?

৫। সমুদ্রের মিত্র কে? সেই মিত্রের আচরণ কিরূপ?

৬। সমুদ্রে যখন ঝড় দেখা দেয় তখন তাহা কি রূপ ধারণ করে?

৭। "যতই তোমার ভাব ভাবি হে অন্তরে,
ততই বিস্ময়রসে হই নিমগন ;"
—কাহার কথা ভাবিয়া কাহার মন বিস্ময়-রসে নিমগ্ন হয়?

৮। "এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যাহার উপরে—"
—কাহার সম্বন্ধে কে একথা বলিয়াছেন? এই প্রকাণ্ড কাণ্ড কি?

৯। শব্দার্থ লেখ ও বাক্য রচনা কর ঃ—
পরিমল, মনোহর, প্রলয়, প্রসুপ্ত, কল্লোলমালা, কলরব, নীলাম্বর।

১০। শেষ স্তবকটি গদ্যে রূপান্তরিত কর।

১১। (ক) "যতই তোমার ভাব……ভিতরে গোপন।"
(খ) "আপনার মনে……ভ্রূক্ষেপ নাই।"
—কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে? লেখকের নাম কি? উদ্ধৃত অংশের অন্তর্গত ভাব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

## মৌখিক প্রশ্ন

১। সমুদ্রের ঢেউকে কবি কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

২। সমুদ্রের ফেনরাশির সঙ্গে কবি কিসের তুলনা দিয়েছেন?

৩। সমুদ্রে ভাসমান পোতশ্রেণী দেখে কবির কি মনে হয়েছে?

## অতিরিক্ত মন্তব্য

ফরফর, টলমল, ঢলমল, আলুথালু, টলে টলে, ঢলে ঢলে, দাপাদাপি—প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক পদের ব্যবহার লক্ষ্য করবার মতো। এগুলি খাঁটি দেশী শব্দ।




[ রচনা-পরিচয় । কবি রাজনৈতিক সামাজিক জীবনের কলকোলাহলে অংশ নিতে চান না, শান্ত প্রকৃতির সরল গ্রাম্য রূপটির দিকেই তাঁহার আকর্ষণ—এই কথাটিই খুব সুন্দরভাবে এখানে বলা হইয়াছে। ]

আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি
সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাই না হতে নববঙ্গে
নবযুগের চালক।
আমি নাই বা গেলেম বিলাত,
নাই-বা পেলাম রাজার খিলাত,
যদি পরজন্মে পাই রে হতে
ব্রজের রাখাল বালক—
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে
সুসভ্যতার আলোক।

যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশীবটের তলে,
যারা গুঞ্জাফুলের মালা গেঁথে
পরে পরায় গলে,
যারা বৃন্দাবনের বনে
সদাই শ্যামের বাঁশি শোনে,
যারা যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে
শীতল কালো জলে—
যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশীবটের তলে।

'ওরে বিহান হল, জাগোরে ভাই,'
ডাকে পরস্পরে।
ওরে ওই যে দধি-মন্থ-ধ্বনি
উঠল ঘরে ঘরে।

হেরো মাঠের পথে ধেনু
চলে উড়িয়ে গো-খুর-রেণু,
হেরো আঙিনাতে ব্রজের বধূ,
দুগ্ধ দোহন করে।
'ওরে বিহান হল, জাগোরে ভাই,'
ডাকে পরস্পরে।

আমি হব না ভাই নববঙ্গে
নবযুগের চালক।
আমি জ্বালাব না আঁধার দেশে
সুসভ্যতার আলোক।
যদি ননি-ছানার গাঁয়ে
কোথাও অশোক-নীপের ছায়ে
আমি কোনো জন্মে পারি হতে
ব্রজের গোপবালক
তবে চাই না হতে নববঙ্গে
নবযুগের চালক।

## অনুশীলনী

১। কবি কি কি হইতে চান না? কি ছাড়িয়া দিতে চান? কবির কি হইবার ইচ্ছা?

২। কবি সুসভ্যতার আলোক কেন ছাড়িয়া দিতে চান? কবি কেন রাখাল বালক হইতে চান?

৩। নিচের অংশগুলি কোন্ কবিতা হইতে উদ্ধৃত? কাহার লেখা? ইহাদের প্রসঙ্গ বর্ণনা কর এবং বক্তব্য বুঝাইয়া দাও ঃ—(ক) আমি হব না ভাই নববঙ্গে···আলোক। (খ) যদি ননি-ছানার গাঁয়ে···গোপবালক।

৪। শব্দার্থ লেখ ঃ—সুসভ্যতা, নবযুগ, বিলাত, খিলাত, ব্রজের, ধেনু, বৃন্দাবন, শ্যামের বাঁশি, বিহান, দধি-মন্থ-ধ্বনি, গো-খুর-রেণু, আঙিনা, ননি-ছানার গাঁ, অশোক-নীপ।

৫। এই কবিতায় কবির কিরূপ মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে? এইরূপ মনোভাবের কারণ কি?

৬। নববঙ্গের চালক বলিতে কবি কি বুঝাইয়াছেন? কবি তাহা হইতে চান না কেন?

৭। শুধু 'রাখাল বালক' না বলিয়া ব্রজের রাখাল বালক বলা হইল কেন?

৮। এই কবিতায় দুই রকম জীবনাদর্শের কথা আছে। কি কি? ইহার মধ্যে কোন্‌টি কবির পছন্দ? কেন পছন্দ বলিয়া তোমার মনে হয়?

## মৌখিক প্রশ্ন

১। কবি কি হতে চান না?

২। কি হতে চান?

৩। কোথায় যাবেন না?

৪। রাজার কাছ থেকে কি পেতে চান না?

## অতিরিক্ত মন্তব্য

কবিতাটির ছন্দে একটা নাচুনি ভঙ্গি আছে। বালকের আনন্দের উচ্ছ্বাস যেন সেই ছন্দে ধরা পড়েছে।




—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ **রচনা-পরিচয়।** এই কবিতায় একটি দুরন্ত ছেলের ছবি আছে। বিশ্বপ্রকৃতিকে সে নিজের দরকারে লাগায় না তার মাসির মতো ; গ্রামের জমিদারের মতো তার মন শুধু স্বার্থের বিষয়েই বাঁধা নয়। তাই জগতের সে একচ্ছত্র অধিকারী—বিশ্ব তার কাছে মুক্ত, সেও বিশ্বের সঙ্গে মুক্তি-মন্ত্রে যুক্ত। ]

হিরণমাসির প্রধান প্রয়োজন রান্নাঘরে।
দুটি ঘড়া জল আনতে হয় দিঘি থেকে—
তার দিঘিটা ঐ দুই ঘড়ারই মাপে
রান্নাঘরের পিছনে বাঁধা দরকারের বাঁধনে।

এ দিকে তার মা-মরা বোনপো,
গায়ে যে রাখে না কাপড়,
মনে যে রাখে না সদুপদেশ,
প্রয়োজন যার নেই কোনো কিছুতেই,
সমস্ত দিঘির মালেক সেই লক্ষ্মীছাড়াটা।
যখন খুশি ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে
মুখে জল নিয়ে আকাশে ছিটোতে ছিটোতে সাঁতার কাটে,
ছিনিমিনি খেলে ঘাটে দাঁড়িয়ে,
কঞ্চি নিয়ে করে মাছ-ধরা খেলা,
ডাঙায় গাছে উঠে পাড়ে জামরুল,
খায় যত, ছড়ায় তার বেশি।

দশ-আনির টাক-পড়া মোটা জমিদার,
লোকে বলে দিঘির স্বত্ব তারই—
বেলা দশটায় সে চাপড়ে চাপড়ে তেল মাখে বুকে পিঠে,
ঝপ করে দুটো ডুব দিয়ে নেয়,
বাঁশবনের তলা দিয়ে দুর্গানাম করতে করতে চলে ঘরে—
সময় নেই, জরুরী মকর্দমা।
দিঘিটা আছে ওর দলিলে, নেই তার জগতে।

আর ছেলেটার দরকার নেই কিছুতেই,
তাই সমস্ত বন-বাদাড় খাল বিল তারই—
নদীর ধার, পোড়ো জমি, ডুবো নৌকো, ভাঙা মন্দির,
তেঁতুলগাছের সবার উঁচু ডালটা।

## অনুশীলনী

১। দিঘির জলে হিরণমাসি কি করে? কি করে মোটা জমিদার?

২। হিরণমাসির বোনপো দিঘিতে কি করে? দিঘি ছাড়াও কোথায় কোথায় তাহার গতিবিধি?

৩। দিঘিটার আসল মালিক কে? কেন?

৪। নিচের অংশগুলি কাহার লেখা, কোন্ কবিতা হইতে গৃহীত? কোন্ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে? বক্তব্য অংশ বিশ্লেষণ কর ঃ—

(ক) তার দিঘিটা ঐ......বাঁধনে।

(খ) দিঘিটা আছে তার দলিলে ..জগতে।

(গ) আর ছেলেটার দরকার......বিল তারই।

৫। বাক্য রচনা কর—প্রয়োজন, দরকার, সদুপদেশ, মালেক, লক্ষ্মীছাড়া, ছিনিমিনি, দশ-আনি, স্বত্ব, জরুরী, মকর্দমা, দলিল, বন-বাদাড়, পোড়ো।

৬। এই কবিতায় গ্রামের যে প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা আছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৭। এই কবিতায় উল্লিখিত বালকটির দুরন্তপনার নিদর্শন দাও।

৮। দিঘির উপরে কার কতটা কর্তৃত্ব—হিরণমাসির, জমিদার আর মাসির বোনপো? কেন বলা হইয়াছে—'সমস্ত জমির মালেক সেই লক্ষ্মীছাড়াটা?'

## মৌখিক প্রশ্ন

১। বালক হিরণমাসির কে হয়?

২। দিঘির মালিক কে?

৩। হিরণমাসি দিঘিতে কি করে?

৪। জমিদার কি করে দিঘিতে?

৫। জমিদার দেখতে কেমন?

## অতিরিক্ত মন্তব্য

১। বিশেষণ পদের ব্যবহারে বৈশিষ্ট্য—

**মা-মরা** বোনপো ; **টাক-পড়া** মোটা জমিদার, **মাছধরা** খেলা।

২। গদ্যের মতো লেখা, কিন্তু ভেতরে একটা ছন্দের স্পন্দন অনুভব করা যায়।

# জাতির পাঁতি

## সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

**কবি-পরিচয়।** সত্যেন্দ্রনাথ ( ১৮৮২-১৯২২ ) ছিলেন রবীন্দ্রযুগের খুব জনপ্রিয় কবি। তিনি নানা ছন্দে অপরূপ সব কবিতা লিখিতেন। তাঁহার কবিতায় একদিকে হাল্কা-মেজাজের নানা রচনা আছে—অন্যদিকে আছে স্বাধীনতার জন্য গভীর ব্যাকুলতা। পুরাণ-ইতিহাসের বিবিধ কাহিনী অবলম্বন করিয়া তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন।

[ **রচনা-পরিচয়।** আমাদের দেশে জাতিভেদ-প্রথা সমাজজীবনে প্রচণ্ড দুর্দৈবের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে—আমাদের সামগ্রিক অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করিতেছে। তাহার বিরুদ্ধে কবি উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এই কবিতায় ]

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে।
সে জাতির নাম মানুষ জাতি ;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।

শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।

দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,
জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারি সমান রাঙা,

বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র,
কৃত্রিম ভেদ ধুলায় লোটে।

পঙ্কিল যত পল্বলে আজ
শোনো কল্লোল বন্যাজলে
জমা হয়েছিল যত জঞ্জাল
গেল ভেসে গেল স্রোতের বলে।

নিবিড় ঐক্যে যায় মিলে যায়
সকল ভাগ্য সব হৃদয়,
মানুষে মানুষে নাই সে বিশেষ
নিখিল ধরা যে ব্রহ্মময়।

## অনুশীলনী

১। কবি সত্যেন্দ্রনাথ মানুষের জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে যে মনোভাব এই কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা নিজের ভাষায় সংক্ষেপে বিবৃত কর।

২। নিচের চরণগুলির সরলার্থ লেখ—(ক) জগৎ জুড়িয়া···মানুষ জাতি। (খ) বামুন শূদ্র···ধুলায় লোটে।

৩। প্রথম আটটি চরণের গদ্যরূপ লেখ।

৪। নিচের অংশগুলি কোন্ রচনা হইতে গৃহীত? কাহার লেখা? ইহাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ কর। বক্তব্য বুঝাইয়া বল।

(এ) কালো আর ধলো···সমান রাঙা।

(খ) নিবিড় ঐক্যে···ব্রহ্মময়।

৫। বাক্য রচনা কর—কৃত্রিম, ঐক্য, ডাঙা, রাঙা, নিবিড়, পঙ্কিল, পলবল, কল্লোল, জঞ্জাল, নিখিল।

৬। এই কবিতায় ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলির একটি তালিকা দাও—উহাদের কাল নির্ণয় কর।

৭। কবি "কৃত্রিম ভেদ" বলিতে কি বুঝাইয়াছেন? তিনি কি এই ভেদের পক্ষে? কেন?

৮। "জাতির পাঁতি" কথার মানে কি? উহা আমাদের সমাজ-জীবনে কি ধরনের দুর্দৈব সৃষ্টি করে? উহা ভাঙিয়া ফেলিবার কথা কেন বলিয়াছেন কবি?

৯। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে কি ধরনের ঐক্য কবি দেখিয়াছেন? "নিখিল ধরা যে ব্রহ্মময়" এ কথার তাৎপর্য কি?

## মৌখিক প্রশ্ন

১। বামুন-শূদ্রে ভেদ কি জাতীয়?
২। কবির মতে জগতে কটা জাতি?
৩। তার নাম কি?
৪। এই কবিতা কার লেখা?
৫। তাঁর আর-একটি কবিতার নাম কর।

## অতিরিক্ত মন্তব্য

কচি, কাঁচা, ডাঁটো, ছোপ, ডাঙা—এই জাতীয় শব্দগুলি একদিকে। অন্যদিকে পঙ্কিল, পল্বল, কল্লোল, ব্রহ্মময় প্রভৃতি শব্দ। এদের পার্থক্য লক্ষ্য কর।

# হয়তো

## কুমুদরঞ্জন মল্লিক

**কবি-পরিচয়।** কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০) ছিলেন বাংলার পল্লীর কবি। পল্লীগ্রামের সরল সাধারণ ছবি ও মানুষের বুকের অনেকখানি ভালোবাসা নিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার রচনায়। তাঁহার কবিতার ভাষাও খুব সরল আর স্পষ্ট। একটা গভীর আন্তরিকতা তাঁহার সব লেখায় পাওয়া যায়।

[ **রচনা-পরিচয়।** এই কবিতায় কবি অতি সরল মধুর ভাষায় এই পৃথিবীর প্রতি আপনার গভীর ভালোবাসা ব্যক্ত করিয়াছেন। ]

হয়তো আমার এ পথে আর হবে নাকো আসা,
দু'ধারে যাই রোপণ ক'রে বুকের ভালোবাসা।
ধুলার এ-পথ যাই ভিজায়ে,
শ্যামল আসন যাই বিছায়ে,
অমন ক'রে যাই রেখে যাই, ক্ষণিক কাঁদাহাসা।

সরায়ে দিই পথের কাঁটা, ছড়ায়ে যাই ফুল,
নিকায়ে যাই স্নেহের বেদী ছায়া-তরুর মূল।
মমতা মোর পথের কীটও
পায় যেন হায় পায় যেন গো,
বন-বিহগের কণ্ঠে আমার অমর হউক ভাষা।

জানিনে এ মানব-জনম আবার পাব কিনা।
নিরুদ্দেশের যাত্রী রাখি প্রণয়-রাখীর চিনা।
অনুভূতির ছিন্ন সূত্র
যাই রেখে যাই যত্র-তত্র,
পারবে না যা করতে পরশ কালের কর্মনাশা।

হয়তো কারও হরবে ক্ষুধা আমার তরুর ফল,
স্নিগ্ধ কারও করবে দেহ অশ্রুদীঘির জল।
ঝরাফুলের গন্ধে ওরে
হয়তো কেহ স্মরবে মোরে,
ভাবুক-পথিক বলবে হেসে লোকটা ছিল খাসা॥

## অনুশীলনী

১। এই কবিতায় কুমুদরঞ্জন পৃথিবীর এবং মানবজীবনের প্রতি যে গভীর ভালোবাসার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও।

২। প্রথম দুইটি স্তবকের গদ্যরূপ লেখ।

৩। নিচের অংশগুলি কোন্ কবির কোন্ কবিতা হইতে গৃহীত ? উহাদের প্রসঙ্গ নির্ণয় কর এবং বক্তব্য বিশ্লেষণ কর।

(ক) সরায়ে দিই···হউক ভাষা।

(খ) জানিনে এ মানব-জনম···কর্মনাশা।

(গ) হয়ত কারও···খাসা।

৪। শব্দার্থ লেখ—রোপণ, ক্ষণিক, নিকায়ে, বন-বিহগ, নিরুদ্দেশ, যত্রতত্র, পরশ, কর্মনাশা, হরবে, স্নিগ্ধ, স্মরবে, খাসা।

৫। নিচের পদগুলির পরিচয় ( বিশেষ্য বিশেষণ ইত্যাদি ) দাও—

ভালোবাসা, ক্ষণিক, মমতা, ওরে, খাসা, ভাবুক, পায়।

৬। কবি পৃথিবীতে কি রাখিয়া যাইতে চাহিয়াছেন ? কিভাবে রাখিয়া যাইতে চাহিয়াছেন ?

৭। এই বিশ্বপ্রকৃতির গাছ, ফুল, দীঘির জল, বনের পাখি প্রভৃতির মধ্যে কবি কিভাবে নিজের ভালোবাসা রাখিয়া যাইতে চাহিয়াছেন ?

## মৌখিক প্রশ্ন

১। কবি তাঁর ভালোবাসাকে কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন ?

২। কবি পথের কীটকে কি দিতে চেয়েছেন ?

৩। কবি কার কণ্ঠে নিজের ভাষা রেখে যেতে চেয়েছেন ?

৪। 'হয়তো' কবিতা কার লেখা ?

৫। কবির লেখা আর-একটি কবিতার নাম কর।

## অতিরিক্ত মন্তব্য

১। 'চিনা' এই শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'চিহ্ন' থেকে।

২। 'সূত্র' এই সংস্কৃত শব্দ থেকে হয় 'সুতো।'

৩। 'কাঁটা' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'কণ্টক' থেকে।

S.C.E.R.T., West Bengal Library Calcutta 25/3, B. T. Road



# মানুষ

## যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

**কবি-পরিচয়।** যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের বাহিরে গিয়া কবিতা লিখিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার রচনায় মানুষের বাস্তব জীবন-ও দুঃখ-বেদনার কথা বিশেষভাবে রূপ পাইয়াছে।

[ **রচনা-পরিচয়।** কবি শ্রমজীবী কৃষককেই 'মানুষ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহার শ্রমে দুঃখে একাত্ম হইতে চাহিয়াছেন। ]

জ্যৈষ্ঠ দুপুরে গলদ্‌ঘর্ম, বলদ লয়ে
চষে যারা রাঙা মাটি,
কত না ঝঞ্ঝা মুষলের ধারা মাথায় বয়ে
ক্ষেত করে পরিপাটী ;
আশা যার ভাসে আকাশে আকাশে মেঘের বুকে,
ধরণীগর্ভে ধ্বন ;
বোকামি পড়ে না ন্যাকামিতে ঢাকা যাদের মুখে,
ধুলা কাদা আভরণ ;
অট্টালিকার উপায় থাকিতে হাজারতরো
যার চালা ঘুচে নাই—
ঘৃণা কি করুণা করো না তাদের, শ্রদ্ধা করো,
তারা মানুষেরই ভাই।

নির্বোধ যারা, দুর্বোধ যারা পল্লীপারে,
অশ্লীল যার ভাষা ;
আশি শতাব্দী ধরিয়া যাদের দৈন্য বাড়ে—
চির নাবালক চাষা।

হলের ফলকে লক্ষ্মী উঠিলে, করিয়া দান
লক্ষ্মীমানের ঘরে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া, প্রাণ
দেয় যারা নিজ করে ;

বেতসের মতো সভ্যশিক্ষা শেখে নি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি—
বটের মতন খোলামাঠে আজও রয়েছে খাড়া.
তারা মানুষেরই জাতি ॥

## অনুশীলনী

১। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'মানুষ' কবিতায় কাহাদের কথা বলিয়াছেন? কবিতাটির এইরূপ নামকরণের কারণ কি?

২। এই কবিতায় কৃষকদের সম্বন্ধে কবির কিরূপ মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে?

৩। সরলার্থ লেখ—(ক) আশা যার ভাসে……ধন। (খ) অট্টালিকার উপায়……ঘুচে নাই। (গ) আশি শতাব্দী…চাষা।

৪। নিচের অংশগুলি কোথা হইতে উদ্ধৃত? উহাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ কর। বক্তব্য বিশ্লেষণ কর।

(ক) হলের ফলকে…নিজ করে। (খ) বেতসের মতো…মানুষেরই জাতি।

৫। নিচের শব্দের কোন্‌গুলি বিশেষ্য. কোন্‌গুলি বিশেষণ—বোকামি, ন্যাকামি, ঘৃণা, করুণা. নির্বোধ, দৈন্য, অশ্লীল।

৬। শব্দার্থ লেখ ও বাক্য রচনা কর—গলদ্‌ঘর্ম, ঝঞ্ঝা, পরিপাটী, আভরণ, শতাব্দী, নাবালক, লক্ষ্মীমান।

৭। কৃষকদের জীবন ও স্বভাবের কি বৈশিষ্ট্য এখানে ফুটিয়াছে? অন্যদের সঙ্গে উহাদের পার্থক্য কোথায়?

৮। কবি কাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'ঘৃণা কি করুণা করো না তাদের'। কেন বলিয়াছেন?

৯। কবি কি কৃষকদের দয়া করিতে বলিয়াছেন? কেন? কৃষকদের প্রতি তিনি কিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন?

১০। "তারা মানুষেরই জাতি"—কাহাদের কথা বলিয়াছেন কবি? এই কবিতার নাম 'মানুষ' হইল কেন?

## মৌখিক প্রশ্ন

১। এই কবিতায় কবি কাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন?

২। 'মানুষ' কবিতার লেখক কে?

৩। কৃষকদের প্রতি কিরূপ মনোভাব গ্রহণ করতে বলেছেন কবি?

৪। 'ঘৃণা কি করুণা করো না তাদের'—কাদের?

## অতিরিক্ত মন্তব্য

ক. 'বেতসের মতো সভ্যশিক্ষা শেখেনি যারা'

খ. 'বটের মতন খোলামাঠে আজও রয়েছে খাড়া'

এই দুটি অংশে উপমা আছে। উপমা হল একটি অলঙ্কার—অর্থালঙ্কার। অলঙ্কার ব্যবহার করলে কাব্য সুন্দর হয়।



# কুলি মজুর

## কাজী নজরুল ইসলাম

**কবি-পরিচয়।** নজরুল ইসলাম বাংলার বিপ্লবী কবি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কবিতায় তিনি পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্য বারবার আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি তরুণদের মনের-প্রাণের-কাজের—সবদিকের স্বাধীনতার দরজা খুলিয়া দিতে বলেন তাঁহার কবিতায়। শোষিত মজুর-কৃষকদের তিনি শুনাইয়াছিলেন সাম্যের বাণী। কবি নজরুল গান রচনায়ও বিশেষ দক্ষ ছিলেন। রবীন্দ্র-সংগীতের পরেই এ দেশে নজরুল-গীতির জনপ্রিয়তা। কবি ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

[ **রচনা-পরিচয়।** এই কবিতায় কবি শোষিত শ্রমিকদের জাগরণের গান গাহিয়াছেন। তিনি আহ্বান জানাইয়াছেন—শোষণের অবসান হউক, সাম্য আসুক—আসুক বিশ্বের শ্রমজীবীর মৈত্রী। ]

আসিতেছে শুভ দিন—
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ—
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দুপাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান—
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান !
তুমি শুয়ে রবে তে-তলার পরে, আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে !
সিক্ত যাদের সারা দেহ-মন মাটির মমতা-রসে,
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে।
তারি পদ-রজ অঞ্জলি করি' মাথায় লইব তুলি,
সকলের সাথে পথে চলি' যার পায়ে লাগিয়াছে ধূলি !
আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত পীড়িতের মাখি' খুন
লালে লাল হয়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ !

আকাশের আজ যত বায়ু আছে হইয়া জমাট নীল,
মাতামাতি ক'রে ঢুকুক এ বুকে, খুলে দাও যত খিল !
সকল আকাশ ভাঙিয়া পড়ুক আমাদের এই ঘরে,
মোদের মাথায় চন্দ্রসূর্য তারারা পড়ুক ঝ'রে !
সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি'
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শোনো এক মিলনের বাঁশি ।
মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান,
ঊর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান !

## অনুশীলনী

১। প্রথম আট চরণের গদ্যরূপ লেখ ।

২। কুলিমজুরের বর্তমান যে দুরবস্থা এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির যে স্বপ্ন কবি দেখিয়াছেন তাহা নিজের ভাষায় লেখ ।

৩। কবির সহানুভূতি যে গরিব শোষিত মানুষের প্রতি তাহা এই কবিতার সাহায্যে বুঝাইয়া দাও ।

৪। নিচের অংশগুলি কোন্ কবির কোন্ কবিতার অংশ ? উহাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ কর ও বক্তব্য বুঝাইয়া দাও ।

(ক) আসিতেছে শুভদিন…ঋণ ।

(খ) মহা-মানবের…শয়তান ।

৫। সমাস ও ব্যাসবাক্য নির্ণয় কর—

মহামানব, মহাবেদনা, চন্দ্রসূর্য, পদরজ, মহা-উত্থান, বেদনা-আর্ত, দেহ-মন, মমতা-রস ।

৬। "আসিতেছে শুভদিন"—কোন্ দিনকে কবি শুভদিন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন ? কেন ?

৭। কুলি-মজুরের অবস্থা কি ? এই অবস্থার কারণ কি ? কিভাবে এই অবস্থার পরিবর্তন হইবে বলিয়া কবি মনে করেন ?

৮। "অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে"—এই কথা কাহাদের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে ? কেন ?

৯। নজরুল ইসলাম তাঁহার এই কবিতায় কিভাবে শোষণমুক্তির, সাম্যের ও বিশ্বমৈত্রীর গান গাহিয়াছেন ?

### মৌখিক প্রশ্ন

১। 'কুলি মজুর' কবিতা কার রচনা ?

২। কবির অন্য কোন কবিতার নাম কর ।

৩। এই কবিকে সাধারণত কি বিশেষণে ভূষিত করা হয় ?

৪। কবির সমর্থন ও শ্রদ্ধা কাদের প্রতি ?

৫। কবির মতে বিশ্বনিয়ন্ত্রণের ভার কাদের উপর থাকা উচিত ?

## অতিরিক্ত মন্তব্য

১. 'মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান—'
একটি বাক্যে তিনবার 'মহা' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করবার মতো। এর ফলে একটা মহিমা এবং বিস্তারের ভাব বিশেষভাবে মুদ্রিত।

২. খুন, শয়তান, খিল, মাতামাতি—এ-জাতীয় শব্দের পাশে নবারুণ, পদ-রজ, বেদনা-আর্ত প্রভৃতি শব্দ স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত।



# আমি কবি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

**কবি-পরিচয়।** কল্লোলযুগের কবি ও গল্পলেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁহার কবিতায় দুঃসাহসিক অভিযানের সুর আছে। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গভীর মমতাও তাঁহার লেখার একটি বৈশিষ্ট্য।

[ **রচনা-পরিচয়।** আধুনিক কালের কবি কবিতাকে আর স্বপ্ন-বিলাসের এবং কাল্পনিক সৌন্দর্যলোকের বস্তু বলিয়া মনে করেন না—তিনি কবিতাকে বাস্তব-জীবন এবং শ্রমিক জনতার কাছে আনিতে চাহিয়াছেন। ]

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর
ছুতোরের, মুটে মজুরের
—আমি কবি যত ইতরের।

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের ;
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই !
কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই,
ছুতোরের ধরি তুরপুন,
কোন্ সে অজানা নদীপথে ভাই—
জোয়ারের মুখে টানি গুণ।
পাল তুলে দিয়ে কোন্ সে সাগরে,
জাল ফেলি কোন্ দরিয়ায় ;
কোন্ সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ,
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই
—কুঠার-ঘায়।

সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি
আর খাল কাটি ভাই, পথ বানাই।
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই !

## অনুশীলনী

১। প্রেমেন্দ্র মিত্র কাহাদের কবি হইতে চাহিয়াছেন? কোন্ ধরনের জীবন কবির পছন্দ?

২। "কবি স্বপ্নের ও বিলাসের কবি নন, কর্মের কবি—শ্রমিকের কবি?" 'আমি কবি'—এই কবিতার সাহায্যে ব্যাপারটি বুঝাইয়া বল।

৩। নিচের অংশগুলি কোথা হইতে উদ্ধৃত? কি প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে? ইহাদের বক্তব্য কি?

(ক) আমি কবি ভাই কর্মের……সময় যে হায় নাই।

(খ) আমি কবি যত কামারের……যত ইতরের।

(গ) সারা দুনিয়ার…… পথ বানাই।

৪। শব্দার্থ লেখ—কামার, কাঁসারি, তুরপুন, গুণ, দরিয়া, ইতর, খোয়া, মর্ম।

৫। সমাস ও ব্যাসবাক্য লেখ—বিলাস-বিবশ, কুঠার-ঘায়।

৬। কবি কি কি কাজ করিতে চাহিয়াছেন?

৭। কোন্ ধরনের ব্যাপার কবির একেবারে পছন্দ নয়?

## মৌখিক প্রশ্ন

১। কবি কাদের কাদের কবি?

২। কামারের সঙ্গে তিনি কি করতেন?

৩। জোয়ারের মুখে কবি কি করতেন?

৪। কবির নাম কি?

## অতিরিক্ত মন্তব্য

লক্ষণীয়ঃ মুটে, মজুর, ইতর, তুরপুন, গুণ, হাতুড়ি—এইসব বিষয় কবিতায় অনায়াসে স্থান পাচ্ছে। আগে এইসব বিষয় এবং শব্দ কবিতায় জায়গা পেত না। সেখানে শুধু সুন্দর জিনিসই থাকতে পারত।




কবি-পরিচয়। জীবনানন্দ ( ১৮৯৯-১৯৫৪ ) রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। যেমন মৌলিক তাঁহার কল্পনা, তেমনি গভীর তাঁহার সৌন্দর্যপ্রীতি ও যন্ত্রণাবোধ।

[ **রচনা-পরিচয়**। এই কবিতায় কবি গ্রামবাংলার একটি সুন্দর বাস্তব ছবি আঁকিয়াছেন এবং পল্লী-প্রকৃতির সঙ্গে আপনার একাত্মতা প্রকাশ করিয়াছেন। ]

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হ'য়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়,
হয়তো বা হাঁস হবো—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায় :
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধ-ভরা জলে ভেসে-ভেসে ;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায় ;
হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে ;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে ;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে ;
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায় ;—রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক ; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—

## অনুশীলনী

১। কবি বাংলার পল্লীর যে বর্ণনা এই কবিতায় দিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বল।

২। এই কবিতায় জীবনানন্দ বাংলার পল্লীর সম্পর্কে যে ভালোবাসা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বুঝাইয়া দাও।

৩। নিচের কথাগুলির অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর—ধানসিঁড়িটির তীরে জলাঙ্গীর ঢেউ, সবুজ করুণ ডাঙা, রূপসার ঘোলা জল।

৪। কবি পরজন্মে কি কি রূপ লইয়া বাংলায় ফিরিয়া আসিবার কল্পনা করিয়াছেন ?

৫। নিচের অংশগুলি কাহার কোন্ কবিতা হইতে উদ্ধৃত ? প্রসঙ্গ উল্লেখ কর ও বক্তব্য বুঝাইয়া দাও।

(ক) হয়তো ভোরের কাক……কাঁঠাল-ছায়ায়।

(খ) আবার আসিব আমি……করুণ ডাঙায়।

(গ) রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে……ভিড়ে।

৬। এই কবিতাটি হইতে নয়টি বিশেষণপদ খুঁজিয়া বাহির কর।

৭। কবি কোথায় ফিরিয়া আসিবেন ? কেন ?

৮। জন্মান্তরে কবি কি হইতে চাহিয়াছেন ?

৯। এই কবিতায় ভাষা দিয়া ছবি আঁকা হইয়াছে—এইরূপ দুইটি ছবি নিজের কথায় প্রকাশ কর।

১০। এই কবিতায় কি কি পাখির কথা আছে—উহাদের কাহার কিরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে ?

## মৌখিক প্রশ্ন

১। কার লেখা কবিতা ?

২। কবি কোথায় ফিরে আসতে চেয়েছেন ?

৩। কিশোর কি করছে।

৪। শিশু কি করছে ?

## অতিরিক্ত মন্তব্য

১. সবুজ **করুণ** ডাঙায়। করুণ এই বিশেষণ একটু অসাধারণ।

২. রাঙা মেঘ **সাঁতরায়ে**—বক মেঘের মধ্য দিয়ে ভেসে আসছে। কিন্তু **'সাঁতরায়ে' বলায় রাঙা মেঘ লাল রঙের** নদী হয়ে উঠল যেন।




—অজিত দত্ত

**কবি-পরিচয়।** অজিত দত্ত একালের কবি হইলেও, দুঃখযন্ত্রণার সুর তাঁহার কবিতায় মাঝে মাঝে প্রকাশ পাইলেও, তাঁহার রচনায় একটি কোমল মাধুর্যও লক্ষ্য করা যায়।

[ রচনা-পরিচয়। আধুনিক জীবনযাত্রা অত্যন্ত জটিল ও কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কবি একটু কৌতুকের সুরে সেই বাস্তব জীবনধারার কয়েকটি ছবি আঁকিয়াছেন। ]

প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির ?
ঝুলে কি থাকতে পারো সুস্থির ?
নইলে
রইলে
ট্রাম না চড়ে
ভ্যাবাচাকা রাস্তায় পড়ে বেঘোরে।

প্র্যাকটিস করেছ কি দৌড়ে ?
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, আর ভোঁ-উড়ে ?
নইলে
রইলে
লরিতে চাপা,
তাড়া ক'রে বাড়ি থেকে বাড়িয়ো না পা।

দাঁত আছে মজবুত সব বেশ ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস ?
নইলে
রইলে
ভাত না খেয়ে
চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।

স্থির করে পা দুটো ও মনটা,
দাঁড়াতে পারো তো বারো ঘণ্টা ?
নইলে
রইলে
না কিনে ধুতি
যতই দোকানে গিয়ে করো কাকুতি।

## অনুশীলনী

১। এই কবিতায় কোন্ সময়ের কথা বলা হইয়াছে ? এই সময়ে জীবন ধারণ করিতে গেলে কি কি জানা দরকার ?

২। 'নইলে' কবিতায় কবির ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সেই মনোভাব বুঝাইয়া দাও।

৩। এই কবিতা হইতে দুইটি অব্যয় পদ এবং তিনটি বিদেশী শব্দ খুঁজিয়া বাহির কর।

৪। বাক্য রচনা কর—ভ্যাবাচাকা, বেঘোরে, ভোঁ-উড়ে, মজবুত, কাকুতি।

৫। প্রথম দুটি স্তবকের গদ্যরূপ লেখ।

৬। তৃতীয় স্তবকের ব্যাখ্যা কর।

৭। কুস্তির প্যাঁচ জানা দরকার কেন ?

৮। দৌড় প্র্যাকটিসের কি প্রয়োজন ?

৯। দাঁত মজবুত থাকা খুব জরুরী কেন ?

১০। বারো ঘণ্টা স্থির হইয়া দাঁড়াইবার অভ্যাস কেন প্রয়োজনীয় ?

১১। শেষ স্তবকে কোন্ সময়ের কথা বলা হইয়াছে ? এখন ঐ অবস্থার কোন পরিবর্তন হইয়াছে কি ? ঐ স্তবকটির বক্তব্যের আর কোন তাৎপর্য এখন আছে কি ?

## মৌখিক প্রশ্ন

১। কার লেখা কবিতা ?

২। দাঁত মজবুত না থাকলে কি হবে ?

৩। কুস্তির প্যাঁচ জানা না থাকলে কি অসুবিধে ?

## অতিরিক্ত মন্তব্য

শব্দ ব্যবহার লক্ষ্য কর—

ট্রাম, লরি, প্র্যাকটিস—বিদেশী শব্দ। ভ্যাবাচাকা, ভোঁ, প্যাঁচ—দেশী শব্দ। সুস্থির—তৎসম শব্দ।
দাঁত, পাথর—তদ্ভব শব্দ।



# মৌমাছি

দিনেশ দাস

**কবি-পরিচয়।** দিনেশ দাস আধুনিক কালের কবি। সমাজসচেতনতা এবং সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস তাঁহার বহু কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে।

[ **রচনা-পরিচয়।** বাঁধা-ধরা জীবনে বন্য প্রকৃতির রূপ স্বাদ গন্ধ যে সরসতা ও প্রাণের উচ্ছলতা আনিতে পারে তাহার কথাই কবি এখানে বলিয়াছেন। ]

জীবন্ত ফুলের ঘ্রাণে
দুপুরের মিহিস্বপ্ন ছিঁড়েখুঁড়ে গেল ;
জেগে দেখি আমি,
এসেছে আমার ঘরে ছোট এক বুনো মৌমাছি,
ডানায় ডানায় যার অরণ্যফুলের কাঁচা ঘ্রাণ,
পাঁশুটে শরীরে যার সোঁদা গন্ধ অজানা বনের।
কেমন সুন্দর ওই উড়ন্ত মৌমাছি !
অশ্রান্ত করুণ ওর গুনগুনানিতে
কেঁপে ওঠে মাটির মসৃণতম গান,
আর দূর-পাহাড়ের বন্ধুর বিষণ্ন প্রতিধ্বনি !
যেন আজ বাহিরের সমস্ত পৃথিবী
আর সমস্ত আকাশ
আমার ঘরের মাঝে তুলে নিয়ে এল
কোথাকার ছোট্ট এক বুনো মৌমাছি !

### অনুশীলনী

১। কবির ঘরে কোথা হইতে মৌমাছিটি আসিয়াছিল ? মৌমাছিটি আসিতে কবির কি মনে হইল ?

২। এই কবিতাটির সারমর্ম নিজের ভাষায় লেখ।

৩। কোথা হইতে অংশগুলি উদ্ধৃত ? প্রসঙ্গ উল্লেখ কর ও বক্তব্য বুঝাইয়া দাও। (ক) অশান্ত করুণ…প্রতিধ্বনি। (খ) যেন আজ…বুনো মৌমাছি।

৪। শব্দার্থ লেখ—ঘ্রাণ, জীবন্ত, অরণ্য, পাঁশুটে, অশ্রান্ত, মসৃণতম, বন্ধুর, বিষণ্ণ।

৫। কোন্ জাতীয় পদ ( বিশেষ্য, বিশেষণ ইত্যাদি ) বল—জীবন্ত, মিহি, ছোটো, বুনো, কাঁচা, পাঁশুটে, সোঁদা, অজানা, সুন্দর, উড়ন্ত, অশ্রান্ত, করুণ, দূর, বন্ধুর, বিষণ্ণ, সমস্ত।

৬। মৌমাছিটি দেখিতে কেমন ? তাহার গায়ে কিসের গন্ধ ? তাহার গুন-গুনানিতে কিসের সুর ?

৭। কবির ঘরের মধ্যে মৌমাছি কি তুলিয়া আনিল ? কিভাবে আনিল ?

৮। কবিতাটির শেষ সাতটি চরণের গদ্যরূপ ( চলিত ভাষায় ) লেখ।

## মৌখিক প্রশ্ন

১। কবির নাম কি ?

২। কবির ঘরে কি এসেছিল ?

৩। তার গায়ে কিসের গন্ধ ?

## অতিরিক্ত মন্তব্য

জীবন্ত ফুল, মিহি স্বপ্ন, সোঁদা গন্ধ, মসৃণতম গান, বিষণ্ণ প্রতিধ্বনি—বিশেষণ শব্দগুলির ব্যবহার একটু বিশেষ ধরনের।




কবি-পরিচয়। সুকান্ত ভট্টাচার্য ( ১৯২৬-১৯৪৭ ) অতি অল্প বয়সে মারা-যান। কিন্তু ইহার মধ্যেই তিনি কবিতা রচনায় বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করেন। তাঁহার কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতি। পৃথিবীতে সাম্য-মৈত্রী আসুক এই আশার বাণী তাঁহার কবিতায় বার বার শোনা গিয়াছে। অনেকে তাঁহাকে বিপ্লব ও বিদ্রোহের কবি বলিয়া অভিহিত করেন।

[রচনা-পরিচয়। কবি একটি মোরগের কাহিনীর মধ্য দিয়া শোষিত মানুষের বাঁচার সংগ্রাম এবং নিপীড়িত হইবার কথা বলিয়াছেন।]

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেলো
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে
ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায়—
আরো দু-তিনটি মুরগির সঙ্গে।

আশ্রয় যদিও মিললো,
উপযুক্ত আহার মিললো না।
সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে প্রতিকারে প্রতিবাদ জানিয়ে
গলা ফাটালো সেই মোরগ,
ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত—
তবুও সহানুভূতি জানালো না সেই বড় শক্ত ইমারত।
তারপর শুরু হলো তার আঁস্তাকুড়ে আনাগোনা।

আশ্চর্য! সেখানে প্রতিদিন মিলতে লাগলো
ফেলে-দেওয়া ভাত রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার।
তারপর একসময় আঁস্তাকুড়েও এলো অংশীদার
ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা দু-তিনটি মানুষ;
কাজেই দুর্বলতর মোরগের খাবার গেলো বন্ধ হয়ে।

খাবার ! খাবার ! খানিকটা খাবার !
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বার বার চেষ্টা করলো প্রাসাদে ঢুকতে,
প্রত্যেকবারেই তাড়া খেল প্রচণ্ড
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দ্যাখে
প্রাসাদের ভেতর রাশি-রাশি খাবারের।

তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেলো,
একেবারে সোজা চলে এলো
ধবধবে শাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার-টেবিলে,
অবশ্য খাবার খেতে নয়
খাবার হিসেবে।

## অনুশীলনী

১। একটি মোরগের কাহিনী তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

২। কবি এই মোরগের মধ্য দিয়া কাহাদের কথা বলিয়াছেন ? এই কবিতার মধ্য দিয়া কবির কি মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে ?

৩। নিচের অংশগুলি কোথা হইতে উদ্ধৃত ? প্রসঙ্গ উল্লেখ কর এবং বক্তব্য বিশ্লেষণ কর ঃ

(ক) তারপর এক সময়ে···বন্ধ হয়ে।
(খ) ছোট মোরগ···খাবারের।
(গ) অবশ্য খাবার···হিসেবে।

৪। বাক্য রচনা কর ঃ—আশ্রয়, প্রাসাদ, গাদা, উপযুক্ত, সুতীক্ষ্ণ, সহানুভূতি, ইমারত, আঁস্তাকুড়, চমৎকার, অংশীদার।

৫। সমাস ও ব্যাসবাক্য নির্ণয় কর—
ভাতরুটি, দু-তিনটি, অসহায়, খাবার-টেবিল।

৬। মোরগ কোথায় আশ্রয় পাইয়াছিল ? খাবারের অভাবে সে কি করিল ? কোথায় কোথায় খোঁজ করিল ? সে কি সফল হইল ?

৭। মোরগ কিভাবে খাবার টেবিলে আসিল ?

৮। মোরগ প্রাসাদে ঢুকিতে চেষ্টা করিয়াছিল কেন ? কি ফল হইয়াছিল ? অবশেষে সে কিভাবে ঢুকিতে পারিল ?

## মৌখিক প্রশ্ন

১। কবিতাটি কার লেখা ?

২। কবির অন্য কোন কবিতা পড়েছ ?

৩। মোরগ চিৎকার করেছিল কেন ?
৪। মোরগ কোথায় ঢুকতে চেয়েছিল ?
৫। সে কি সেখানে ঢুকতে পেরেছিল ?
৬। কিভাবে ?

## অতিরিক্ত মন্তব্য

১। 'সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে প্রতিকারে প্রতিবাদ'—এর প্রতিটি শব্দে একটা বিদ্রোহের জোরালো স্বর শোনা যায়।
২। 'ফেলে-দেওয়া ভাতরুটির **চমৎকার** প্রচুর খাবার'—চমৎকার শব্দটির মধ্যে তীব্র বিদ্রূপ আছে।
৩। 'খাবার **খেতে নয়,**
খাবার **হিসেবে**'
'খেতে নয়' এবং 'হিসেবে' শব্দগুলির ব্যবহার ব্যঙ্গকে কিভাবে তীক্ষ্ণ করে তুলেছে তা লক্ষ্য করবার মতো।

## পরিশিষ্ট : বিশেষ আলোচনা

### ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

'আনন্দমঠে'র অংশ। উপন্যাসে বর্ণনা, ঘটনা, চরিত্রের সংলাপ—এ সবই থাকে। এখানে বর্ণনামূলক কিছু অংশমাত্র গ্রহণ করা হয়েছে। দুশ বছর আগে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং অত্যাচারী রাজশক্তির অর্থলোলুপতায় জন-সাধারণের জীবনে যে বীভৎস দুর্ভোগ নেমে এসেছিল তার মর্মন্তুদ বর্ণনা এখানে করা হয়েছে। লেখক তীক্ষ্ণ বাস্তবদৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষের সব কটি কারণ খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। মন্বন্তরক্লিষ্ট বাঙালীর জীবন, গৃহ, পরিবার, গ্রাম যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল তার কঠিন বেদনাদীর্ণ রূপটি কবিত্বময় হয়ে উঠেছে। কবিত্বময় বর্ণনা যে শুধু ললিত কোমল সুন্দর হয় না, কুৎসিত ও ভীষণও হতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র তা দেখিয়েছেন।

### বিদ্যাসাগরের জিদ

জীবনীমূলক রচনা। জীবনের তথ্যমূলক বিবরণ দেননি রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের গভীরে প্রবেশ করে তাঁর মহান চরিত্রের একটি-দুটি দিকের বিশ্লেষণ করেছেন। বাঙালীর ইতিহাসে বিদ্যাসাগর যে অসামান্য পৌরুষ নিয়ে দেখা দিয়েছিলেন তার চিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। লেখকের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে মাঝে মাঝে ভাষায় কৌতুক মিশ্রিত হয়ে রচনাটিকে বিশেষ উপভোগ্য করে তুলেছে।

### গঙ্গার শোভা

বর্ণনামূলক রচনা। ভ্রমণকাহিনীর অংশ। বিবেকানন্দের ভাষায় চলিত বাংলার শক্তিময় একটি রূপ ফুটে উঠেছে। ঐ ভাষা যেমন সহজ লৌকিক তেমনি দ্রুতগতি ও জোরালো। যেন লেখকের নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটেছে ভাষায়। তার সঙ্গে মিশেছে সৌন্দর্যবোধ এবং স্বদেশপ্রেম।

### মন্ত্রের সাধন

বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ। শ্রেষ্ঠ বাঙালী বৈজ্ঞানিক সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় বিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। এতে বিশেষভাবে মানুষের আকাশ-জয়ের বিচিত্র সাধনা, বিফলতা এবং বিফলতার মধ্য দিয়ে সাফল্যের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সহজ মনোরম ভাষায় বিজ্ঞানী মানবসাধনার জয়গান গেয়েছেন, শিখিয়েছেন কোন নিষ্ঠাপূর্ণ চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় না।

### চন্দ্রগুপ্ত ও সেকেন্দার

'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অংশ। বাংলার এক প্রধান নাট্যকার ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে নাটকটি লিখেছেন। এই অংশে দেশপ্রীতির সুন্দর পরিচয় আছে।

লক্ষ্য করবার মতো সংলাপের ভাষা। তা যেমন কবিত্বময় তেমনি ঘাত-প্রতিঘাতে নাট্যোদ্বেল। গাম্ভীর্য ও আবেগ এই ভাষার একটি প্রধান গুণ।

### রাজদ্বারে শ্মশানে চ

বাংলার অন্যতম প্রধান গল্পকার শরৎচন্দ্রের লেখা একটি কৌতুককাহিনী। লালুকে নায়ক করে লেখা গল্পটিতে লেখক কিশোরচরিত্রের ভিতরে প্রবেশ করেছেন। তার দুরন্তপনা, দুষ্টুমি এবং গভীর মানবতাবোধ নানা গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। এ গল্পে অবশ্য লালুর দুঃসাহস ও দুষ্টুমিই প্রধান। গোপালখুড়োর চরিত্রটিও জীবন্ত। গল্পের পরিণতি যেমন আকস্মিক তেমনি হাস্যোজ্জ্বল।

### বঙ্গভঙ্গ

স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে সারা দেশে যে ব্রিটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল তার প্রাণোত্তাপপূর্ণ ছবি। ঐ আন্দোলনই এই দেশের প্রথম গণ-আন্দোলন। ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা ও স্বদেশপ্রেমের তীব্রতা এই বিবরণকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

### সেনাপতি শিবনাথ

'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের অংশ। একটি পৃথক কাহিনী হিসেবেও পড়া যায়। শিবনাথের বালক-সুলভ যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা একদিকে যেমন তার বয়সোচিত স্বাভাবিক ছেলেমানুষি প্রকট করে তুলেছে, অন্যদিকে তার তেজস্বিতার পূর্বাভাসও পাওয়া যাচ্ছে—খোঁজ মিলছে তার কল্পনাশক্তিরও।

### যাত্রার আসরে অপু

'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। অপু তার নায়ক। অপুর শৈশবের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে এই যাত্রাগান শোনা অন্যতম। লেখক তাঁর সংযত সহজ ভাষায় যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে যাত্রাপালার বাস্তব অবিশ্বাস্য রূপের ছবি পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে কিছুটা ব্যঙ্গ-কৌতুকের স্পর্শও লেগেছে। এই যাত্রাপালাই আবার অপুর দৃষ্টিতে কেমন স্বপ্নময় মোহময় রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। লেখক আশ্চর্য কুশলতায় এই দুই বিপরীত সুরকে মিশিয়েছেন।

### নীলবিদ্রোহ

ইংরেজদের শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষক-আন্দোলনের একটি অধ্যায়। নীলচাষীরা ইংরেজ নীলকরদের বিরুদ্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধর্মঘট করেছিল। লেখক উত্তপ্ত ভাষায় এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন—কিন্তু ঘটনার বিবরণে ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন।

### ইংরেজ-পূর্ব বাংলার ঐশ্বর্য

এই প্রবন্ধে নবাবী আমলের বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যের এক পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। রচনাটি যেমন পুরনো বাণিজ্যিক ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ, তেমনি স্বদেশী বোধেরও সহায়ক। ইংরেজদের শোষণে ও শাসনে পুরনো দিনের সোনার বাংলা রিক্ত হয়ে পড়ল—এই তুলনা মনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা জাগিয়ে তুলবে।

### কাবুলের বাজার

বৈঠকী মেজাজের চমৎকার লেখা। ভাষার মধ্যে একটা সহজ দ্রুতগতি, সাধারণ কথাবার্তার ঢঙ আছে। বর্ণনা হয়ে উঠেছে ছবি। আর ভাষায় ও বিষয়ে মিলে একটা অনুচ্চ কৌতুকহাস্য রয়েছে। তা ছাড়া ভ্রমণকাহিনী হিসেবেও এ লেখা সার্থক। কাবুলের বাজারের একটি বিশিষ্ট চরিত্র এই রচনায় ফুটে উঠেছে।

### মহানিষ্ক্রমণ

মহান স্বাধীনতা-সংগ্রামী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কর্মময় জীবনের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। কিভাবে তিনি গৃহে অন্তরীণ অবস্থা থেকে ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে দেশত্যাগ করেছিলেন এই রচনায় তার চমকপ্রদ বিবরণ আছে। সহজ ভাষায় এই নাটকীয় কাহিনী জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

### মহাকাশ অভিযান ও আর্যভট্ট

বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ। কৃত্রিম উপগ্রহ-বিজ্ঞানে ভারতের অগ্রগতির বিবরণ দিয়েছেন। ভাষা যেমন সহজ তেমনি সরাসরি পাঠকের কাছে পৌঁছয়। রচনাটি তথ্যপূর্ণ। এ-জাতীয় জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের ক্ষেত্রে এরূপ রচনারীতিই আদর্শ।

### হনু-ভানু মিতালি

কৃত্তিবাসী রামায়ণের এই অংশটুকুতে কৌতুকরসের প্রাধান্য। হনূমানের বীরত্ব যতটা, কৌতুকসৃষ্টির ক্ষমতা তার চেয়ে কম নয়। কবি সূর্যদেবের গৌরবকেও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। মূল বাল্মীকি-রামায়ণ থেকে মাঝে মাঝেই কৃত্তিবাস সরে এসে সাধারণ স্তরের পাঠকদের কাছে তাঁর রচনাকে উপভোগ্য করে তুলেছেন।

### মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন

পুরনো বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লেখা কাব্য খুবই কম। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে প্রতাপাদিত্যের কাহিনীতে কতকটা ঐতিহাসিকতা আছে। এই ক্ষুদ্র অংশে অতি সংক্ষিপ্ত দ্রুততায় কবি প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসের কিছু অংশ বিবৃত করেছেন। লেখকের ভাষায় ঘষামজা পরিচ্ছন্ন রূপটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত।

### মেঘনাদের মৃত্যু

মেঘনাদবধকাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী অংশ। কবির বর্ণনাশক্তি গাম্ভীর্য ও করুণাকে যুগপৎ প্রকাশ করেছে। বীররস এবং বেদনাব্যাকুলতার মিলন ঘটেছে। কবির উপমাদি ব্যবহারের কৌশল অতি উন্নত মানের।

### ভারতসঙ্গীত

স্বাদেশিকতার সুরটি বেশ তীব্রভাবে আবেগকম্পিত কণ্ঠে প্রকাশ করা হয়েছে। একটা বীররসাত্মক ভাব আছে এই কবিতায়।

### সমুদ্রদর্শন

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা কবির মনে যে উল্লাসের সৃষ্টি করেছে তাকে ছবির পর ছবি এঁকে ধরে রেখেছেন। সমুদ্রের ভীষণ প্রলয়রূপের ছবিও আছে. কিন্তু রঙ্গময় আনন্দমূর্তিটিই যেন তাঁর বেশি প্রিয়।

### জন্মান্তর

রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণের রাখালিয়া লীলাকে একটা আধুনিক তাৎপর্য দিয়েছেন। রাখালের ঐ মুক্ত সরল গ্রামীণ জীবনের মধ্যে কবি শহর-জীবনের ঐশ্বর্য গৌরব সংগ্রামের চেয়ে অনেক বেশি কাম্য বলে মনে করেছেন। গ্রামের চিরকালীন সেই শান্ত সানন্দ রূপটি চটুল ছন্দে ধরে রেখেছেন।

### বালক

দুরন্ত বালকের চরিত্রটি লক্ষণীয়। তার সহজ স্বাভাবিক দুষ্টুমিকে কবি একটা স্বার্থহীন মনুষ্যচিত্রের মহিমায় উন্নীত করেছেন। আটপৌরে ভাষায় গদ্যের মতো করে এ কবিতা, পরিচিত জীবনের খুব কাছাকাছি হয়েও ভাবের জগতে অনেক উচ্চে উঠেছে।

### জাতির পাঁতি

মানবিক আবেদন, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সত্যেন্দ্রনাথের একটি প্রধান গুণ। তাঁর 'মেথর' প্রভৃতি কবিতার কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। যেমন বিষয়, তেমনি উদাত্ত প্রাণস্পর্শী ভাষা।

### হয়তো

কবির কল্পনায় একটি অসাধারণত্ব আছে। বুকের ভালোবাসা যেন বীজ। মৃত্যুর আগে সেই বীজ তিনি বপন করবেন। ফলে পরজন্মে তিনি হয়ে উঠবেন একটি বনস্পতি। এই চমৎকার কল্পনাটি স্নিগ্ধ ভাষায় প্রকাশিত। এখানেই কুমুদরঞ্জনের বৈশিষ্ট্য।

### মানুষ

শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জোরালো ভাষায় প্রকাশিত। কৃষকদের উপরে ধনবানের শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আছে।

### কুলিমজুর

সাম্যবাদী মুক্তির আহ্বান আছে এই কবিতায়—তার যে ছবি কবি এঁকেছেন তাতেই নজরুলের মৌলিক কল্পনার পরিচয়। আজ নিখিলের…শয়তান—এই কল্পচিত্রে শোষণহীন আনন্দপূর্ণ আলোকোজ্জ্বল জীবনের এক অত্যাশ্চর্য রূপ ফুটে উঠেছে।

### আমি কবি

কবির কণ্ঠস্বর উচ্চ এবং দ্বিধাহীন। এর মধ্যে শ্রমিক-জনতার প্রতি মমতা আছে। কঠিন কর্মের গান গাইছেন কবি। কবিতার ও কবির দায়িত্ব সম্পর্কে একটি নতুন ধারণা এখানে তুলে ধরেছেন কবি।

### আবার আসিব ফিরে

চিত্রধর্ম এই কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ছবিগুলি রঙের বৈচিত্র্যে দৃষ্টি-বিনোদন। তার উপরে গন্ধ ( 'কলমীর গন্ধ-ভরা' ) আছে, আছে স্পর্শ ও ( 'ঢেউয়ে ভেজা' )।

### নইলে

লঘু ঢঙে লেখা—যেন একান্ত সাধারণ কথোপকথনের ভঙ্গি। কবিতার স্বাদে একটা বক্রতা এনেছে। ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ মনোভাব চটুল ভাষারীতিকে ভেদ করে আধুনিক সভ্যতার প্রতি আঘাতে উদ্যত হয়ে উঠেছে।

### মৌমাছি

অতি সূক্ষ্ম ধ্বনিনির্ভর অনুভূতি কবিতাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ক্ষুদ্র মৌমাছির মধ্যে অরণ্য-প্রকৃতির মুক্তির দ্যোতনা এসেছে। সমস্ত আকাশ আর সমস্ত পৃথিবীর প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে মৌমাছি—এ এক অভিনব কল্পনা।

### একটি মোরগের কাহিনী

রূপক কাহিনী-কবিতা। মোরগটি দরিদ্র পীড়িত শ্রেণীগুলির প্রতিনিধি। ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের প্রাসাদে সে পৌঁছবার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু তাতে তার অধিকার নেই। সেখানে সে ভোগের উপকরণ হিসেবেই মাত্র স্থান পেতে পারে। শ্রেণীশোষণের মধ্যে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের একটি ইঙ্গিতও আছে। আর আছে দুর্ভিক্ষপীড়িত জীবনের একটি প্রত্যক্ষ বাস্তব ছবি।

---

S.C.E.R.T., West Bengal Library Calcutta 25/3, B. T. Road